চলচ্ছায়া

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ : বরেন্দ্র লাইব্রেরী :
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট : কলিকাতা

— প্রথম সংস্করণ —
— তেরশ' উনচল্লিশ —
— দাম—দুই টাকা —

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন দে : আইডিয়াল প্রেস :
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট : কলিকাতা

চলচ্ছায়া

সবুজ-সঙ্ঘের বন্ধুদের

দিলাম

আমার চির-জীবনের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার

স্মরণ-চিহ্ন

Out out brief candle, Life
is but a Walking Shadow—
(Shakespeare)

প্রচ্ছদ-পটের লেখাটি শিল্পী-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের আঁকা। উপন্যাসটির ভিতরে কিছু কিছু বিদেশী গল্পের ছায়া আছে।

চলচ্ছায়া

পূর্ব্বাভাস

অসম্ভব রকম কাজের চাপ পড়িয়াছে। বৎসর শেষ হইয়া যাইতেছে। নববর্ষারম্ভে মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব যে কিরূপ বাড়িয়া যায় তাহা আমার ন্যায় ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবেন! নূতন বৎসরে পত্রিকার উন্নতিসাধন করিতেই হইবে; এমন-কিছু নবত্ব তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করা চাই, যাহা গ্রাহক-তালিকাকে দ্বিগুণ পুষ্ট করিবে।—এমনি ধরণের চিন্তায় ও কার্য্যে স্নানাহার ভুলিয়া ব্যাপৃত আছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে একখানি কার্ড্ ধরিল।

পিত্ত জ্বলিয়া গেল! এখন দেখা করিবার সময় নাই। ভৃত্যকে ধমকাইয়া উঠিলাম। ধমক খাইয়া ভীত-কণ্ঠে সে-বেচারা যাহা নিবেদন করিল তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, বাবুটিকে সে বারবার

করিয়া বলিয়াছিল, সম্পাদক-মহাশয় সোমবার কারুর সহিত দেখা করেন না, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া বুধবার কিম্বা বৃহস্পতিবার আসেন। বাবুটি কিন্তু না-ছোড়-বান্দা। আজই তাহার দেখা না করিলে চলিবে না। ইত্যাদি।

কার্ডের উপর চোখ বুলাইয়া দেখিলাম, লেখা আছে—প্রশান্ত ঘোষ ; প্রাক্তন পুলিশ দারোগা ; তরুণগঞ্জ।

কাগজের সম্পাদকের কাছে পুলিশ কর্ম্মচারীর কী প্রয়োজন ? কৌতূহল হইল। ভিতরে আনিতে বলিলাম।

আমার সেদিনের কার্য্য-কোলাহলের ব্যস্ততার মাঝে যে-ব্যক্তি আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল, এ গল্পের ভিতর তাহার প্রধানতম অংশ আছে। সুতরাং, তিনি দেখিতে-শুনিতে কীরূপ, তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণনা দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

আগন্তুকের পানে চাহিতেই প্রথমে চোখে পড়িল, তাহার দীর্ঘ সুঠাম দেহ। বলিষ্ঠ অথচ কমনীয়। সারা মুখে একটি সারল্য এবং বিষাদের ছাপ। চেহারা দেখিয়া বয়সের অপেক্ষা কম-বয়সী বলিয়া মনে হয়।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রলোক অতিশয় বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন ;—কেমন করিয়া আলাপ আরম্ভ করিবেন তাহা যেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছেন না। মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাশিয়া আরম্ভ করিলেন—নমস্কার ! দেখুন, আমায় মাপ করবেন। বড্ড অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম ! দেখ্‌ছি, আপনি ভয়ানক ব্যস্ত। কিন্তু, স্যার, আজ-

কেই আপনার সঙ্গে দেখা না করলে আর হয়ত দেখা করবার সুযোগই পেতাম না। আমি কালই বিশেষ কাজে করাচী চলে যাচ্ছি। সেই জন্যই এত ব্যস্ত হয়ে আজকেই আপনাকে

লোকটি কী অনর্গল বকিতেই পারে! উহাকে না থামাইলে দেখিতেছি নিজে কিছুতেই থামিবে না। বলিলাম—হ্যাঁ; বলুন, আপনার কী প্রয়োজন।

আগন্তুক বিনীতভাবে বলিয়া চলিল—বেশীক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না। কিন্তু আগে আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিই। কার্ডে আমার যে পরিচয় পেয়েছেন, সেটি আমার বর্ত্তমানের সত্য পরিচয় নয়। সম্প্রতি আমি সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করেছি; সুতরাং এখন নিজেকে যদি আপনার কাছে সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিই তা হলে নিশ্চয় অন্যায় করব না?

—নিশ্চয় না। তারপর বলুন।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত-ভাবে টেবিলের কাগজ-পত্র আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে নব-পরিচিত সাহিত্যিক বলিতে লাগিলেন—আমি একটি গল্প লিখেছি। সেটি আপনার কাছে এনেছি,—আপনি যদি দয়া কোরে তাকে আপনার এই বিখ্যাত পত্রিকায় ছাপেন, তারই জন্যে। যদিও আমি নতুন লেখক, তা হলেও আমার বিশ্বাস, গল্পটি পড়লে আপনি খুসী হবেন।

কী বিপদেই পড়িলাম। এমনিতর নূতন লেখকের কত লেখাই যে আমার কাছে জমা হইয়া আছে, বোধ করি তাহার সংখ্যা নাই। তাহাদের না পড়িয়াই খুসী হইয়াছি। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে

যে, তাহাদের রাখিব কোথায় সে স্থান নাই। আবার আর-এক নূতন লেখক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে লইয়া এখন করি কী?

বলিলাম—তা নিশ্চয় হব। আপনার গল্পের বিষয়-বস্তুটি কী?

—বিষয়-বস্তু? সে সম্বন্ধে কী বলব? বিষয়-বস্তু এমন কিছু নতুন নয়—একটী প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার এবং তারই ফলে যে ট্র্যাজিডি সংঘটিত হয়, তারই গল্প।

গল্পের বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত হতাশ বোধ করিলাম। প্রশান্ত হয়ত তাহা বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি বলিল—কিন্তু কী জানেন, গল্পটির একটি বিশেষত্ব আছে। এর মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার একটিও কাল্পনিক নয়, প্রত্যেকটি সত্য। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমার চোখের সামনে ঘটেছে। এ গল্পের আমি শুধু একজন দর্শক-ই নই; আমি এর অভিনেতাও।

বলিলাম—কী জানেন; গল্প-উপন্যাসের মূল্য ঘটনার সত্যা-সত্যের ওপর বিশেষ নির্ভর করে না। সে থাক। কিন্তু হাতে অনেক রচনা জমে রয়েছে; আবার এখন আর একটা নতুন লেখা, ...তাই ভাবছি!

—এটি আপনাকে নিতেই হবে। শুধু পড়ে' দেখবেন। ভাল না লাগে তখন না হয়...। আর, অনেকদিনের পুরণো লিখিয়ে নই, কিম্বা একদিন দারোগা ছিলাম,—এর জন্যে যে আমি ভাল লিখতে পারি না, এমন ত কোন কথা নেই।

ভদ্রলোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া করুণা হইল। দেখিলাম, ইতিমধ্যে তিনি পকেট হইতে একখানি মোটা-খাতা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। বুঝিলাম, উহাই প্রাক্তন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বর্ত্তমানের নব-সাহিত্যিকের সদ্য-রচিত অমূল্য সম্পদ। বলিলাম—আচ্ছা, রেখে যান। দেখবো পড়ে। কিন্তু কবে যে দেখে উঠ্‌তে পারবো তার কোন ঠিক সময় দিতে পারছি না। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

—কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

—তা বলতে পারি নে। মাস তিনেক পরে আসবেন।

—তাই ত, অনেক দিন। আচ্ছা, তাই আসবো।

প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। খাতাখানি উল্টাইয়া দেখিতেছিলাম, বলিলাম—এক মিনিট! দেখছি, গল্পের শিরোনামা রয়েচে—দারোগার কথা; এবং তারপর লেখা আরম্ভ হয়েছে—'আমি' দিয়ে। দারোগা বোধ করি আপনিই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু অন্য নামে। গল্পটি পড়লেই বুঝবেন, আমায় কিছুই বলতে হবে না। আচ্ছা, আসি। তিন মাস পরে আবার দেখা হবে।

যেমন বিব্রত অপ্রস্তুতভাবে প্রশান্ত ঘরে ঢুকিয়াছিল, তেমনি বিব্রত এবং অপ্রস্তুতভাবে সে প্রস্থান করিল। আমিও খাতাখানি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া অসমাপ্ত কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম।

চলচ্ছায়া

বহুদিন পরে, কী একটা কাজে সেই ড্রয়ার-টি খুলিতে গিয়া 'দারোগার কথা' নজরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত ঘোষকে চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কী মিনতি করিয়াই না সে লেখাটি আমায় পড়িতে বলিয়াছিল! সেদিন কোন কাজ হাতে ছিল না। লেখাটি বাহির করিয়া সঙ্গে লইলাম। বাড়ি গিয়া সময় মতো তাহাকে পড়িতে হইবে।

আপিস হইতে বাসা অনেকটা পথ। পথে ট্রামে বসিয়া গল্পের মাঝখানকার খানিকটা অংশ পড়িয়া ফেলিলাম। পড়িয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল বোধ হইল। বাড়ী ফিরিয়াই কাপড়-জামা ছাড়িয়া গল্পটি লইয়া বসিলাম। বেশ মনে আছে, সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই। গল্পটি যেন আমাকে পাইয়া বসিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার পড়িলাম। আবার পড়িলাম।

পরদিন অধিক বেলায় যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সর্ব্বাগ্রে গল্পটির কথাই মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিলাম। মনে হইল যেন আমি একটি মানুষের জীবনের একটী গোপনীয়-তম কথা জানিতে পারিয়াছি। কী ভয়ঙ্কর সেই গোপন কথাটি!! শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন সে কথাটি আবিষ্কার না করিতে পারিলেই ভাল হইত। মনে মনে বলিলাম—মিথ্যা হোক্ আমার আবিষ্কার; আমি যাহা জানিয়াছি তাহা যেন সত্য না হয়…

প্রশান্তর গল্প আমার পত্রিকায় ছাপা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আমি আমার পাঠককে জানাইব। এখন নয়, পরে। গল্পের শেষে পাঠকের সহিত আমার আর একবার সাক্ষাৎ হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহাকে আমি দারোগার কথা উপহার দিলাম। তিনি উহা পাঠ করুন।

এক

আমি যখন শয্যাত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা বোধ করি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন হাতে কোন কাজ ছিল না; এমনি করিয়া বিস্তীর্ণ আলস্যের মধ্য দিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

এই স্থানটিতে আজ আট বৎসর আছি। কিন্তু এতদিন বসবাসের পরেও এখানকার কোন লোকের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া পরিচিত হই নাই। নিজের আত্মমর্য্যাদা এবং অহঙ্কার লইয়া একা-একাই থাকিতাম। দুই-একজন যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল তাঁহাদের বিবরণ পাঠক যথাস্থানে পাইবেন।

মুখ হাত ধুইয়া চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজখানি লইয়া বসিয়াছি, এমন সময় বাহিরে কাহার অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কে যেন আমার ভৃত্য সদানন্দকে বলিতেছে:

—কখন তিনি ওঠেন। আমি কী দাঁড়াবো?

সদানন্দ বলিতেছে—দাঁড়াবে কি না তা আমি কেমন করে' বলব। এই মাত্র বোধ হয় তিনি উঠ্‌লেন।

বুঝিলাম, কেহ আমারই খোঁজ করিতেছে। হাঁকিয়া বলিলাম —কে, সদানন্দ। পাঠিয়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে একজন কৃশকায় লোক ভিতরে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল। বলিলাম—কী চাও?

—আজ্ঞে, আমি কুমার-বাহাদুরের কাছ থেকে আসছি। তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—তিনি কী এখানে এসেছেন না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল রাত্রে এসেচেন। এই যে তাঁর চিঠি।

দ্বারের বাহির হইতে সদানন্দ বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল—আবার এসেছেন বুঝি? দু'বছর ছিলেন না, বেঁচেছিলাম। এইবার আবার সুরু হবে। আর তার সঙ্গে আমাদের বাবুও…

ধমক দিয়া উঠিলাম। চুপ কর সদানন্দ। সদানন্দ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

এই সদানন্দকে লইয়া আর পারি না! যখন-তখন যাহার-তাহার সম্মুখে এমন-সব কথা বলিয়া বসে যাহাতে আমাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইতে হয়। কী করি। পিতা-পিতামহের আমলের লোক, কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ; তাই তাহার সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া লইতে হয়।

চিঠিখানি হাতে লইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—তিনি এখন কী করছেন? তুমি কে? তোমায় ত এর আগে দেখি নি।

—আজ্ঞে তিনি এখন বাগানে বসে' চা খাচ্ছেন। আমি এই

এক-বছর হল রাজা-বাবুর কাজে লেগেছি। আমার নাম কার্ত্তিক।

আমি ততক্ষণ চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছি। সেই পরিচিত কুদৃশ্য হস্তাক্ষর এবং বাঁকা-চোরা লাইন। পত্রে লেখা আছে—

"ভাই বিন্নু,

নিশ্চয় বেঁচে আছো ; এবং নিশ্চয় তোমার বন্ধুটিকে আজো ভুলে যাও নি। পত্র-পাঠ চলে' আসবে। আমি কাল রাত্রে এখানে এসেচি ; এবং প্রিয়-দর্শনে বঞ্চিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু বুঝতেই পারছো, কাল রাত্রে মাত্রাধিক্যের ফলে আমার হাত পা এখনো সচল হয়ে ওঠে নি। শীঘ্র এসো। পথ চেয়ে রইলাম।

তোমার

অরি।"

কুমার বাহাদুরের নাম—অরীন্দ্রজিৎ রায়।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিতেই কুমার-বাহাদুরের খাস-চাকর জিজ্ঞাসা করিল—কী বলব তাঁকে ?

এ প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কুমার-বাহাদুর সরলভাবেই আমার বন্ধুত্ব যাচিঞা করে বটে, কিন্তু আমি ত সেরূপ কোন বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করি না। বরং মনে মনে আমি তাহাকে অপছন্দ করি। সে জন্য তাহার আহ্বানকে

এ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করিলেই আমার পক্ষে স্বাভাবিক এবং শোভন হইত। তাহা ছাড়া, পুনরায় তাহার বাগান-বাটীতে যাওয়া এবং তাহার সহিত অবাধে মেলা-মেশা করা,—ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় এ-বারেও আমার স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা আছে। তেমনতর অবাধ অসংযত জীবন আমার সহ্য হয় না এবং তাহা আমার এই গুরু-দায়িত্ব-পূর্ণ সরকারী কার্য্যের পক্ষে বিশেষ বিঘ্নদায়কও বটে।

এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলাম—কুমার-বাহাদুর-কে আমার নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানিও। বোলো, কাজের চাপে বড্ড ব্যস্ত আছি।···আমি এখন···

শেষ কথাটি কিছুতেই বলিতে পারিতেছি না। আমার এই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে আনন্দ উপভোগের যে আমন্ত্রণ আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবার মতো জোর মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

মনে পড়িল, কুমার-বাহাদুরের সেই বিলাস-উদ্যান; চারিদিক ঘেরিয়া তাহার প্রকৃতির অপরূপ শোভা; দিকে দিকে তাহার ছায়া-শীতল রমণীয় কুঞ্জবন; কক্ষে কক্ষে তাহার বিলাস-উপকরণের উচ্ছলিত প্রাচুর্য্য···। আমার অসাড় দেহ-মন বৈচিত্র্যের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

বলিলাম—তাঁকে গিয়ে বলো, আমি সন্ধ্যার আগেই আস্‌ছি।

ভৃত্য নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বারের পাশ হইতে সদানন্দ বলিল—এমন জান্‌লে, পাজীটাকে

বাড়ীতে ঢুক্‌তেই দিতাম না। ছি ছিঃ, আবার গাঁয়ের লোকে কানাকানি করবে। না গেলেই কী নয়?

গম্ভীর স্বরে বলিলাম—থাম্‌ তুই। যা, রহিম-কে বিকেলে গাড়ী ঠিক রাখতে বলগে যা।

বৈকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইলাম। সহর ছাড়াইয়া মাইল খানেক দূরে কুমার বাহাদুরের বাগান। সহরের প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড ঝিল আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহারই পাশ দিয়া আমার গাড়ী চলিতেছিল।

অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। তাহার উপর গুমোট। চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। আকাশে মেঘ করিয়াছে। দীর্ঘিকার জলে তাহারই ছায়া। শান্ত ঝিলের উপর ক্বচিৎ কোথাও দু'-একটা বনের পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। দূরে একটা জেলের নৌকা দেখা যায়। কিছুদূর দিয়া পায়ে চলার যে পথটি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহারই উপর দিয়া গ্রাম্য নর-নারীর দল হাট হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে।

পথ চলিতে চলিতে কুমার-বাহাদুরের সহিত আমার সম্বন্ধের কথা ভাবিতেছিলাম। লোকে জানে, কুমার-বাহাদুর একজন প্রকাণ্ড

ধনী লোক, এবং আমি একজন সামান্য বেতনের দারোগা ;— সুতরাং তাঁহার বন্ধুত্ব পাইবার জন্য আমি লালায়িত। লোকে আরও মনে করে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে এত যে নিবিড় সৌহার্দ্দ, তাহার কারণ, আমরা দুইজনে একই প্রকৃতির লোক, অর্থাৎ দুইজনেই দুশ্চরিত্র। দুইজনেই আমরা লোকমতকে গ্রাহ্য করি না ; দুইজনেই সমাজ এবং সংসার হইতে পৃথক থাকিতে চাই।

কিন্তু তাহারা তো জানে না, মনে মনে এই লোকটার উপর আমার কতখানি অশ্রদ্ধা এবং বিতৃষ্ণা। কুমার-বাহাদুর-কে আমি সম্ভ্রম তো করিই না, বরং প্রকাশ্যেই তাহাকে তাচ্ছিল্য করি। ভীরু সে, অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির ; আমাকে ছাড়িতে চায় না। তাহার প্রতি আমার সকল প্রকার উদ্ধত-ভাবকে সে হাসি-মুখে গ্রহণ করে।

হ্যাঁ, তাহাকে আমি ঘৃণা করি। এবং সেই জন্য যদি সেদিন তাহার কাছে না গিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, তাহা হইলেই স্বাভাবিক হইত, শোভন হইত।

পরে কতদিন কতবার ভাবিয়াছি, সেদিন যদি বন্ধুর বাগানে আমোদ করিতে না যাইতাম তাহা হইলে জীবনের কতখানি দুর্ভাগ্যের হাত হইতে নিজে তো রক্ষা পাইতামই, অন্য পরিচিত অপরিচিত আরও কত লোকই না নিস্কৃতি পাইত !! অতীতের যে স্মৃতির দাহে আজ আমার অন্তর-বাহির পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাই-তেছে, সেদিনের সেই একটি সন্ধ্যার প্রমোদ অভিসারকে নিবৃত্ত

করিতে পারিলেই তাহার কোন উত্তাপই আজ আমায় অনুভব করিতে হইত না।

আমাকে পাইয়া বন্ধুর কলোচ্ছাসের আর বাধা বন্ধ রহিল না। গলা জড়াইয়া, চুমো খাইয়া আমায় কত কী যে বলিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই।

—তুমি, বিনু, ঠিক সেই একই রকম আছো। ভেবেছিলাম, হয় তো কাজের জন্যে এলে না। কত দিন পরে তোমায় দেখলাম বল তো। কী আনন্দ যে আজ আমার!

হাসিয়া বলিলাম—উচ্ছাস তো অনেক হ'ল। এইবার থামো। আরও যে-সব ভদ্রলোক বসে' রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার কাণ্ড দেখে ওঁরা যে হাসচেন।

বাগান-বাড়ীর পিছন দিকে যে একটি ছোট মাঠের মতো আছে, তাহারই উপর টেবিল-চেয়ার বিছাইয়া সপার্ষদ কুমার বাহাদুর শোভা পাইতেছিলেন।

তাহার পাশের চেয়ারে বসিয়াছিলেন একটি অপরিচিত ভদ্রলোক। বেঁটে এবং অত্যন্ত মোটা। মুখের উপর তাহার ক্রুরতার ছাপ। প্রথম দর্শনেই তাহার উপর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।

দ্বিতীয় লোকটি, কুমার-বাহাদুরের জমিদারীর নব-নিযুক্ত গোমস্তা। নাম তিনকড়ি। শান্ত নম্র চেহারা। বয়স প্রায় চল্লিশ। তিনকড়িকে আমার ভালো লাগিল। তাহার সহিত মৃদুকণ্ঠে জমিদারী-সংক্রান্ত আলাপ করিতে লাগিলাম।

কুমার বলিল—এ-কে আজ প্রায় এক বছর হ'ল এখানে পাঠিয়েছি; তা তুমি তো আর ভুলেও এদিক মাড়াবে না যে দেখতে পাবে কে গেল আর কে এলো! তিনকড়ি আমার খুব বিশ্বাসী। হ্যাঁ, ছাখো তিনকড়ি, আমার বন্ধুর জন্যে আজ কিছু পান-ভোজনের অয়োজন কর। বুঝেছ? হাঁ। আর ছাখো, সঙ্গে সঙ্গে—বুঝেছ তো—ওটাও যেন থাকে!

কুমারের শেষ-কথা শুনিয়া আমার কোন-একটি প্রসিদ্ধ নাটকের একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়িয়া গেল। দুশ্চরিত্র নায়ক তাহার ঠিক এমনি ধরণেই গোমোস্তার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বিবৃত করিতেছে।

তিনকড়ির ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। অস্ফুটে কী বলিল, বোঝা গেল না। কুমারের খাস-চাকর, কার্ত্তিক, যাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। মনিবের শেষ কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল—যে আজ্ঞে। সে-সব বিষয়ে আপনাকে কোন চিন্তে করতে হবে না। সময় মতো সব ঠিক পাবেন। আমরা তা হ'লে আপনার অধীনে আছি কোন্ কাজে।

বুঝিলাম, অপূর্ব্ব যোগাযোগ। উপযুক্ত মনিবের এমন উপ-

যুক্ত চাকর সচরাচর চোখে পড়ে না। তিনকড়ির বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলাম।

অরীন্দ্র তখন কাজের কথা পাড়িল—দেখ তিনকড়ি, খাজনা আদায়ের দিকে আর একটু বেশী কোরে নজর রাখবে। আর ঐ যে কে-লোকটা আজ এক বছর এসেছে অথচ এক মাসেরও ভাড়া দেয় নি, ওকে আর রাখা চলবে না। তাগাদা দিয়েছিলে? কী বলে ও?

তিনকড়ি সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে, ওঁর তো মাথার ঠিক নেই। ওঁকে বলে' আর কী ফল। তবে ওঁর মেয়ে বলেছে, শীগ্‌গির-ই বেশী-কিছু পরিশোধ করে' দেবে।

কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল—ওই নীলমাধববাবুর কথা বলছেন বুঝি। হ্যাঁ। উনি আর দিয়েছেন। যে মেয়ে, বাবা! তার কাছে এগোয় কার সাধ্যি। এদিকে গ্রামের লোকগুলো তো তার জন্যে সব পাগল।

কুমার সহসা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল; বলিল—তাই না কি! দেখতে কেমন? কত বয়স?

কার্ত্তিক সোল্লাসে কী বলিতে যাইতেছিল, সহসা তিনকড়ির ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, রাগে তিনকড়ির কপালের শিরগুলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে; চোখ-মুখ বিবর্ণ। কার্ত্তিককে উদ্দেশ করিয়া বলিল—হারামজাদা! ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে ভালোভাবে যদি কথা না বলিস, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। ছোট লোক কোথাকার!

তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া নম্র-কণ্ঠে বলিল—না হুজুর, যা ভাবছেন তা নয়। তাঁরা অত্যন্ত মানী লোক। তাঁর বাপ ভারী পণ্ডিত ছিলেন। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায়, ওঁদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। ওঁরা ভালো লোক। ওঁদের কথা থাক্।

তিনকড়ির উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—চল, অরিণ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

বাগান অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড শিলাস্তূপ আছে। পাথরের এই স্তূপটিকে ঘিরিয়া গ্রামে কত যে কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই। কবে কোন্ যুগে বিদেশের কোন্ রাজা আসিয়া জয়ের স্তম্ভস্বরূপ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া গেছে, তাহা লইয়া ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে আজও বাক্‌বিতণ্ডা চলে। প্রাচীন কালের আলেক্‌জাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের বক্তিয়ার খিলিজি—সকল নামের সহিত তাহারা ইহার সম্বন্ধ স্থাপনা করে।

ইতিহাস যাক্, কিন্তু প্রায় মনুমেণ্ট্ সমান উঁচু এই স্তূপটির উপর দাঁড়াইলে, গ্রামটিকে অতি সুন্দর ছবির মতো দেখায়। আমরা সেই স্তূপের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম।

সহসা উপর হইতে শিশুকণ্ঠের কলহাস্য নির্জ্জন স্থানটিকে মুখর করিয়া তুলিল। মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—টু! ধরতে পারলে না।

পর-মুহূর্ত্তেই ওধার হইতে একটি তরুণী মেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া বালকটিকে জড়াইয়া ধরিল। দুইজনের কেহই আমাদের দেখিতে পায় নাই। তাই তাহাদের বাধাহীন হাসির উচ্ছ্বাস সমস্ত স্থানটিকে চকিত মধুর করিয়া তুলিল।

মেয়েটির বয়স আঠার উনিশ বৎসর হইবে। অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাহার পরণের নীলাম্বরী কাপড়খানি তাহার সৌন্দর্য্যকে যেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। চোখে মুখে তাহার প্রাণের প্রচুর উচ্ছলতা। মুগ্ধ হইয়া মাথার উপরে বালক এবং তরুণীর ক্রীড়া-কৌতুকের রমণীয় দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কুমার এইবার বলিয়া উঠিল—বা, বা, বা! কী চমৎকার মেয়েটি হে! তিনকড়ি, ও তো দেখছি তোমার ছেলে। মেয়েটি?

বলিতে ভুলিয়াছি, তিনকড়ি মৃতদার। একটি বছর চারেকের শিশুসন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী বৎসর দুই হইল মারা গিয়াছে। কুমারের কথায় বুঝিলাম, ছেলেটি তিনকড়ির সেই মা-হারা সন্তান।

মৃদু-কণ্ঠে তিনকড়ি বলিল—নীল-মাধববাবুর মেয়ে।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ণস্বরে বলিল—হুজুর-কে বলুন যেন কোনরকম অসঙ্গত মন্তব্য না করেন। তাতে ওঁদের অত্যন্ত অপমান করা হবে।

ততক্ষণে উপরের দুইজনে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, এবং হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। কাছাকাছি হইতেই মেয়েটির সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় হইল। মনে হইল যেন দূর হইতে সে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছিল।

কুমার আমার কাণে কাণে অস্ফুটে কী-একটা মন্তব্য করিল। আমি তাহাতে কাণ দিলাম না। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, তখন আমার অন্তরের মধ্যে একটী সুগভীর এবং সুপবিত্র অনুভূতি স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মধ্যেকার কবি যেন তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে আমার প্রকৃতির অপরূপ শোভা, মাথার উপর বৈশাখের মেদুর আকাশ এবং বহু দূরে সন্ধ্যাতারার অপরিস্ফুট আত্মপ্রকাশ,—এই আবেষ্টনের মাঝে দাঁড়াইয়া, কবি যেমন করিয়া নারীকে দেখে, তেমনি চোখেই আমি সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখিলাম।

তাহারা নামিয়া আসিতেই তিনকড়ি ডাকিল—মল্লিকা।

মেয়েটি তিনকড়ির মুখের দিকে সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তিনকড়ি বলিল—মল্লিকা, ইনি হচ্ছেন আমাদের জমিদার—কুমার-বাহাদুর। এঁকে প্রণাম করো। আর ইনি হচ্ছেন, আমাদের জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ; হুজুরের বন্ধু।

মল্লিকা আগে আমাকে প্রণাম করিল, তারপর কুমার-কে। পর-মুহূর্ত্তেই শিশুর হাত ধরিয়া মন্থর গমনে সেস্থান পরিত্যাগ করিল। তাহার চলার লীলায়িত ভঙ্গিটীকে বহুক্ষণ নির্ণিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলাম। তাহার সুগঠিত পৃষ্ঠদেশের লম্বিত বেণীর শোভা সে-রাত্রে বহুক্ষণ আমার নয়নের নিদ্রা হরণ করিয়াছিল !

সুন্দরী বালিকা ! সেদিন একবারও কী মনে হইয়াছিল যে, সেই শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যায় যাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য অবলোকন করিলাম, সেই ললিত-তনু মেয়েটিই আমার এই বিপদসঙ্কুল জীবন-নাট্যের নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিবে ?

এখন এতদিন পরে, খাতার পাতায় লাইনের পর লাইন তাহারই কথা লিখিয়া চলিয়াছি, আর বাহিরে বরষার অবিশ্রান্ত ধারা আমার জানালার উপরে সংক্ষুব্ধ প্রকৃতির অনিরুদ্ধ বাণী প্রচার করিয়া যাইতেছে ! আকাশে মেঘের গর্জ্জন। গাছের মাথায় আর্ত্ত হাহাকার তুলিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। বদ্ধ জানালার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেই ঝড়-বাদলের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমার কল্পনাকে সুদূর অতীতের এক সৌম্য-স্নিগ্ধ সন্ধ্যার লগ্নে প্রেরণ করি। আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে—একখানি নির্ম্মল সরল মুখচ্ছবি, সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে অতুলনীয় !

দুই

আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! অন্তরের মধ্যে যাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি, অন্য অনেক ঘনিষ্ঠ পরিচিত অপেক্ষা কেমন করিয়া কোন সুযোগে যে তাহারই সহিত পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে তাহা এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

কোন্ সূত্রে মনে নাই, দ্বিতীয় দিন যখন মল্লিকার সহিত দেখা হইল, তখন আলাপ-পরিচয়ের পর মনে হইল যেন আমরা দুইজনে অতি পুরাতন আত্মীয়,—প্রথম পরিচয়ের কোনরূপ সঙ্কোচের লেশ মাত্র আমাদের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মল্লিকার কুণ্ঠাহীন নিঃসঙ্কোচ এবং সতেজ নারীত্বের শ্রী আমাকে মুগ্ধ করিল। হয়ত তাহার এই ব্রীড়া কুণ্ঠাহীন ব্যবহারের ভিতর মাঝে মাঝে প্রগল্‌ভতার ছাপ থাকিত, কিন্তু সে প্রগল্‌ভতা তাহার ব্যক্তিত্বকে কিছুমাত্র ম্লান করে নাই; বরং মনে হইত, সেটুকু তাহাকে অত্যন্ত মানাইয়া গিয়াছে।

মল্লিকার সহিত কথাবার্ত্তায় লক্ষ্য করিতাম, তিনকড়ির উপর তাহার একটি গভীর শ্রদ্ধার ভাব আছে। হয়ত তিনকড়ি নানা-

রূপে তাহাদের সাহায্য করে, কিম্বা হয়ত তিনকড়ির ছেলেটীকে সে অত্যন্ত ভালবাসে, সেই কারণেই! হেতু যাহাই হোক, তিনকড়ি মল্লিকার মনের অনেকখানি আসন দখল করিয়া আছে। কুমার-বাহাদুরের উপর মল্লিকার অশ্রদ্ধার আর অন্ত নাই। মুখে সে কোনদিন কিছু না বলিলেও তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মল্লিকা মানুষ চেনে।

আমার সম্বন্ধে তাহার যে কী মনোভাব তাহা আজো স্পষ্ট করিয়া বলিবার সময় আসে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা তিনজনে (অর্থাৎ কুমার, তিনকড়ি এবং আমি) বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় মাথার উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মেঘের অন্তরালে সূর্য্যদেব কখন অস্ত গেলেন বুঝিতে পারা গেল না; মনে হইল যেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় রাখালের দল গরুর পাল লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কুটীর অভিমুখে ছুটিয়াছে। গাছে গাছে পাখীদের কলরব শোনা যাইতেছে। আমরা বাড়ীমুখো হইয়া পা চালাইলাম।

দেখিতে দেখিতে হাওয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দু'এক ফোঁটা তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ধারা। অরীন্দ্র বলিল—ওহে বিনু, আর ত যেতে পাচ্ছি না ভাই। হাঁপিয়ে উঠলাম যে। কোথাও দাঁড়াও।

সেই সময় আমরা নীলমাধববাবুর বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছি। তিনকড়ির বাড়ীও দূরে দেখা যাইতেছিল। সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলাম—বেশ ত, চল না, নীলমাধববাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় নেওয়া যাক্। যে রকম মেঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, এতটা পথ হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়।

এ কথা শুনিবামাত্রই ভয়ে অরীন্দ্র নিশ্চল হইয়া গেল, বলিল—চলো তিনকড়ি, নীলমাধবের বাড়ীতেই আপাতক···

কথার মাঝেই তিনকড়ি বলিয়া উঠিল—ওখানে যাবার কী দরকার হুজুর, আর-একটু কষ্ট কোরে আমার বাড়ীতেই চলুন। ওই যে, দেখা যাচ্ছে। ওখানে অপেক্ষা করুন, তার পর বৃষ্টি থাম্‌লেই আমি চাকরকে দিয়ে একখানা গাড়ী আনিয়ে দিচ্ছি।

তিনকড়ির কথা শুনিয়া আমার জেদ বাড়িয়া উঠিল, বলিলাম—তিনকড়ির বাড়ী অনেক দূর। তা ছাড়া নীলমাধববাবুর সঙ্গে পরিচয়টাও হয় নি এখনো। তাই, ওঁর ওখানেই যাওয়া যাক্।

কুমার বলিল—বেশ, বেশ, তাই চলো।

নীলমাধববাবুর বাড়ীর দরজায় যখন আমরা পা দিলাম তখন প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়াছে। তিনকড়ির ডাকাডাকিতে

একটি অল্পবয়স্ক ছোক্‌রা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা ভিতরে ঢুকিয়া সম্মুখের অনতিপরিসর ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

তিনকড়ি তাহাকে প্রশ্ন করিল—মিঠ্‌ঠু, দিদিমণি কোথায় ?

বুঝিলাম, মিঠ্‌ঠু মল্লিকাদের চাকর এবং মিঠ্‌ঠুর উত্তর হইতে ইহাও বুঝিলাম, মল্লিকা বাড়ী নাই।

অনতিকাল পরেই ও-ধারের একটা ঘর হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কে যেন কম্পিত এবং স্খলিত কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিতেছে—মিঠ্‌ঠু, দরজা জানলা সব বন্ধ আছে ত ?

এখান হইতে মিঠ্‌ঠু উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল—আছে, কর্ত্তা, সব বন্ধ আছে।

আবার আওয়াজ আসিল—হ্যাঁ, বন্ধ করে' রাখ্‌। চাবী দিয়ে বন্ধ করে' রাখ্‌। চোর এলেই আমায় খবর দিবি। খাঁড়া নিয়ে বসে' আছি আমি—মা কালীর খাঁড়া। এক-এক কোপ্‌, ব্যস !

আমরা ভীত হইয়া তিনকড়ির পানে তাকাইলাম। তিনকড়ি আমাদের আশ্বস্ত করিয়া বলিল—ভয় পাবেন না আপনারা। উনিই নীলমাধববাবু। মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা চোরের ভয়ে অমনি করে' চেঁচাতে থাকেন।

তিনকড়ি আরও কী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ঘরের বাহিরে কাপড়ের খস-খস শব্দ এবং চাবির ঝন্‌ঝনানি শুনিয়া আমরা সকলেই দ্বারের দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম,

ক্ষিপ্রপদে মল্লিকা সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল ; আমাদের দেখিয়া বিপুল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। নিমেষ মাত্র। তারপরেই চঞ্চল চরণে ঘর হইতে পলাইয়া গেল। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার মুখের উপর যে সস্মিত ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া আর কেহই দেখিতে পাইল না।

তিনকড়ি বলিল—ও আপনাদের এখানে দেখতে পাবার আশা করে নি মোটেই ; তাই অবাক হয়ে গিছল।

আমরা সকলেই সে-কথা স্বীকার করিয়া লইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মিঠ্ঠু আসিয়া আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল —বাবু-রা। দিদিমণি জিজ্ঞেসলেন, আপনারা চা খাবেন?

কুমারের দিকে চাহিলাম, সে হাঁ-না কিছুই বলিল না। তিনকড়ির দিকে তাকাইয়া দেখি সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। অগত্যা বলিলাম—আপত্তি কী? নিয়ে এসো।

তিনকড়ি বলিল—এই চা জিনিষটে, হুজুর, আমার দু'চোখের বিষ। কিন্তু কী করি, সকলের সঙ্গে আমাকেও খেতে হয়। ছেলেবেলায় এর নামও জানতাম না। আর এখন দেখুন না, পাড়াগাঁয়ের ঘরে-ঘরেও এর অভাব নেই।

সুদীর্ঘক্ষণ ধরিয়া চায়ের বিরুদ্ধে তিনকড়ির ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতায় আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাই যখন

ধূমোদ্গারী তিন-পেয়ালা চা লইয়া মিঠ্ঠু প্রবেশ করিল, তখন যেন বাঁচিলাম। তাহার হাত হইতে বাটি-টা লইয়া সশব্দে তাহাতে চুমুক দিলাম।

অনতিকাল পরেই মল্লিকা ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, এইটুকু সময়ের মধ্যে শুধু চা তৈয়ারী-ই নয়, নিজের বেশ অবধি সে পরিবর্তন করিয়াছে। চা এবং সজ্জা, এই দুইয়ের মধ্যেই তাহার রুচির পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত হইলাম।

আমাদের নমস্কার করিয়া, অদূরে একখানি তেপায়ার উপর হাত রাখিয়া সে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। বুঝিলাম, আমাদের কারুকেই আরম্ভ করিতে হইবে। বলিলাম—এমনি কোরে বিনা অনুমতিতে তোমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে উপদ্রব কোরে গেলাম। কিছু মনে কোরো না। বড্ড বৃষ্টি এসে পড়ল।

মল্লিকা ঈষৎ হাসিল। বলিল—বৃষ্টিতে না ভিজে কারুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন—এ-কে উপদ্রব বলে না। তার জন্যে আপনারা যদি নিজেদের অপরাধী মনে করেন তা হ'লে আমরা সত্যিই অপ্রস্তুত হব।

বাহিরে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অতি নিকটেই কোথাও যেন বাজ পড়িল। রুদ্ধ দরজার ভিতর হইতে আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মল্লিকা, এসেছিস্? মিঠ্ঠু দরজা বন্ধ কর। মিঠ্ঠু!

পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়া মল্লিকা ত্বরিত পদে ঘর হইতে

বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনে তিনকড়িও উঠিয়া গেল।

দুইজনে বাহির হইয়া গেলে কুমার এবং আমি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। কুমার নিম্নস্বরে বলিল—দেখ বিনু, তুমি যতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইছিলে, ততক্ষণ তিনকড়িটা কী ভীষণভাবেই তোমার দিকে চেয়েছিল! নির্ঘাৎ তিনকড়ি মেয়েটার প্রেমে পড়েছে!

বলিলাম—আশ্চর্য্য কী! অমন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে না পড়াই আশ্চর্য্য।

কুমার বলিল—সেদিন দেখ নি, কার্ত্তিক যখন মল্লিকার নাম করেছিল, তখন তিনকড়ি কী রকম ভয়ঙ্কর চটে উঠেছিল? সে কি আর শুধু শুধু-ই!

উত্তরে আমি কী বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় তিনকড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—হুজুরের জন্য গাড়ী ঠিক কোরে এলাম। আকাশের যে অবস্থা, তাতে শীগ্‌গির বৃষ্টি থামবে ব'লে মনে হয় না। কতক্ষণ আর এখানে বদ্ধ হয়ে থাকবেন।

কুমার আর একবার আমার পানে চাহিল। বুঝিলাম, আমরা যে এখানে অধিক সময় থাকি, তাহা তিনকড়ির অভিপ্রেত নয়। মনে মনে হাসিয়া কুমারের সহিত গাড়িতে গিয়া উঠিলাম।

তিন

একমাস পরের কথা।

গ্রামের শেষে একটি অতি প্রাচীন দেবী-মন্দির ছিল। সেখানে প্রতি বৎসরে কী এক পর্ব্ব উপলক্ষে মহা ধূম হইত। গ্রামের সমস্ত নর-নারী সেদিন বৈকালে সেখানে সমবেত হইয়া নির্জ্জন স্থানটিকে মুখরিত এবং মন্দির-স্থিত বিগ্রহকে চকিত করিয়া তুলিত।

সেদিন কাজ সারিয়া বৈকালের দিকে সেই দিকে চলিয়াছিলাম। যাইতেছিলাম, পুণ্য-অর্জ্জন বা অন্য কোনরূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নয়,—যাইতেছিলাম, আমারি এক সম্মানার্হ বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে।

ডাক্তার বাসুদেব ঘোষালকে গ্রামের সকলেই জানে। শুধু অমায়িক এবং চরিত্রবান বলিয়াই নয়, এতখানি দরাজ এবং উপচিকীর্ষু অন্তঃকরণ এ সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাসুদেবকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রয়োজন হইলে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করি। খাঁটী একটি মানুষ এই বাসুদেব।

তাহারই অনুরোধে সেদিন পূজার মাঠে যাইতেছিলাম। বার-

বার করিয়া যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছিল ; নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা আছে। কী কথা কে জানে ?

যে-পথ দিয়া হাঁটিতেছিলাম, পূজার মাঠে পৌছিবার সেই একটি মাত্র পাকা রাস্তা। তাই তাহার উপর আজ গ্রাম্য নর-নারীর দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। ছই-তোলা গো-যানেরও অভাব নাই।

পথ চলিতে চলিতে সহসা এমনি একটি গরুর-গাড়ির ছইএর ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। মল্লিকা তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে !

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসিয়া আমায় নমস্কার করিল। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছিল, কথা কহিবার সময় পাইলাম না, হাসি দিয়া তাহার নমস্কারের উত্তর দিলাম।

ক্রমশঃ গো-যান দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া গেল। শুধু আমরা পরস্পর পরস্পরের পানে স্মিতমুখে চহিয়া রহিলাম। শেষে একটা পথের বাঁকে মল্লিকার গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

কতক্ষণই বা ! কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্তের দর্শনেই মল্লিকা আমার মনকে দোলাইয়া দিয়া গেল। লাল রঙের শাড়ীখানি আজ তাহাকে বড়ো চমৎকার মানাইয়াছে ! মল্লিকা রঙিন কাপড় পরিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সেই অতলস্পর্শী আনীল দুই চোখের পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকি; তাহাকে সেই বিশ্রী গাড়ি হইতে নামাইয়া নিজের পাশে লইয়া চলি। সারা পথ মল্লিকার কথা চিন্তা করিতে করিতে পূজার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অসম্ভব জনারণ্য। দূরে একটা তাঁবু খাটাইয়া মুখে রঙ লাগাইয়া উঁচু একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া একটা লোক বক্তৃতা করিতেছে; বোধ হয় ম্যাজিক দেখাইতেছে। তাহার পাশে নানা রকমের দোকান-পাট বসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য নরনারীর সমাগমে মেলা গম্‌গম্ করিতেছে।

কোথায় বাসুদেব? এই ভীড়ের মধ্যে কেহ কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস বাতুলতার নামান্তর মাত্র। সে চেষ্টা না করিয়া অলসভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

সহসা অনতিদূরে একটি পরিচিতা মেয়েকে দেখিতে পাইয়া দেহমন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দুই-বন্ধুর জীবনে কত বিপ্লবই না ঘটিয়া গিয়াছে! বাসুদেব যদি আজ এখানে থাকিত, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক কথাই তাহার সহিত আলোচনা করিতাম।

মেয়েটির নাম সবিতা। বয়স তার কুড়ি কি একুশ। কলি-

কাতার হোষ্টেলে থাকিয়া ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়াছে। পিছনে ওই যে গম্ভীর-মুখ দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, উনি সবিতার পিতা—শ্রীদুর্লভ রায়। দুর্লভবাবুর পিতা-পিতামহেরা এককালে প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তখনকার দিনে তাহাদিগকে এ-অঞ্চলের রাজা বলা হইত। সে দিন গিয়াছে, কিন্তু সেদিনের সেই ধন-দৌলতের আকাশ-চুম্বী গর্ব্ব পুরুষানুক্রমে নামিয়া আসিয়া দুর্লভবাবুর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আছে। তাঁহার সেই অত্যধিক আত্ম-গরিমার জন্য তাঁহাকে আমি পছন্দ করিতাম না।

পরিচয় তাঁহাদের সহিত আমার অনেক দিনের। এবং অনেক দিনের অনেক কথাই বলিবার আছে। সময়ান্তরে সে-সব কথা আপনাদের জানাইব। উপস্থিত, সবিতাকে দেখা না দিয়া পাশ কাটাইয়া আমি বাড়ী ফিরিবার পথ ধরিলাম।

দু'-চার পা অগ্রসর হইতেই দেখি, সম্মুখে—বাসুদেব!

—কতক্ষণ ধরে' তোমায় যে খুঁজচি, তার ঠিক নেই! কোথায় ছিলে?

বলিলাম—ঠিক ওই কথাগুলো তোমার ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

—তাই নাকি। বেশ। এখন চল, এই ভীড়ের বাইরে গিয়ে বাঁচি।

মেলার ওধারে, যেখানে লোকের ভীড় অপেক্ষাকৃত কম, সেই-খানে বেড়াইতে বেড়াইতে দুইজনে কথা কহিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, বাসুদেব প্রায়ই দুর্লভবাবুর বাড়ী যাতায়াত করে। তাঁহাদের যে এই মাত্র দেখিতে পাইয়াছি তাহা প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দুর্লভবাবুর ওখানে যাও? সবিতা কেমন আছে?

—মন্দ নয়। ভালোই আছে। সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

—কি জিজ্ঞাসা করছিল?

—দুঃখ করছিল, তুমি আর ওদের ওখানে যাও না। বলছিল, দেখা হ'লে জানতে চাইবে, হঠাৎ তুমি ওদের প্রতি এতখানি উদাসীন হয়ে উঠলে কেন। এখন দেখা হ'লে তুমি ওদের চিনতেই চাও না।

বলিলাম—দেখা হ'লে চিনতে পারি নে—এটা ঠিক সত্যি নয়।

—হ্যাঁ সত্যি। দিনকয়েক আগে দুর্লভ বাবুর সঙ্গে তোমার পথে দেখা হয়েছিল; ভদ্রতার খাতির রেখে তুমি তাঁকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত কর নি।

—সত্যি কথা বলতে কী, আমি তাঁকে দেখতে পারি না। কেমন যেন সদাই গর্ব্বিত ভাব। কিন্তু তবুও সাম্‌নাসামনি দেখা হ'লে আমি নিশ্চয় তাঁকে একটা নমস্কার করতাম। সেদিন তাঁকে আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু সে কথা যাক, ভাবে বোধ

হচ্ছে, তুমি আমায় কিছু বলতে চাও। তা, ইতঃস্তত করছ কেন ? যা বলবার বল, আমি শুনতে প্রস্তুত হয়েই আছি।

—হ্যাঁ, আমি তোমায় অনেক কথাই বলতে চাই, আর সে সব কথা ওঁদেরই সম্বন্ধে। প্রথম যখন ওঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ হল, তখন থেকেই ওঁরা তোমায় আপনার মতো কোরে গ্রহণ করেছিলেন ! সবিতার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের পর তুমি প্রায় প্রত্যহই ওঁদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করলে এবং তার ফলে সবিতার মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। তুমি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে এবং তা বুঝেও তার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হতে লাগলে। এমনি কোরে বছরখানেক কাটবার পর, আজ মাস ছয়েক হ'ল তুমি হঠাৎ ওঁদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছ ; কী যে কারণ, তা একমাত্র তুমিই জানো। তোমার জন্যে তাঁরা আজো অপেক্ষা কোরে বসে আছেন ; কিন্তু তোমার কোন সাড়াই নেই ? হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হোয়ে ওঠবার কারণ কী ?

—একজনদের বাড়ী যাই না বলেই আমি নিষ্ঠুর—এ তোমার মন্দ আবিষ্কার নয়, বন্ধু। কিন্তু—

—ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। কেন তুমি সে মেয়েটিকে এমন ক'রে প্রত্যাখান করছ ? তুমি জানো, সে তোমায় ভাল বাসে। জেনে-শুনে তুমি এমন নির্ম্মমভাবে তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছ—তোমার মধ্যে এমন প্রবৃত্তি ত আমি আশা করি নি।

দেখিলাম—বাসুদেব বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়াছে ! তাহার

আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর সবিতার কথা বলিতে বলিতে কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহার দুর্ব্বলতার গোপন কাহিনীটুকু আমি জানি। বলিলাম—শোন, দু’-চার কথায় আমার বক্তব্য তোমায় বলে নি। সবিতা মেয়েটি খুব ভাল, তাকে আমি স্নেহ করি; আমার দ্বারা সে আঘাত পায়, সে ইচ্ছে আমার কোনদিন নয়। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার আগে থাকতেই তুমি সে বাড়ীতে আসা-যাওয়া কর, এবং শুধু আসা-যাওয়াই নয়, সেই মেয়েটির প্রতি,···না, না, এতে লজ্জিত হবার কিছুই নেই, তার প্রতি তোমার মন উন্মুখ হোয়ে উঠেছে—তখনই আমি সে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিজেকে আড়াল করে’ ফেললাম। তোমার মতো বন্ধুর সুখের পথে দাঁড়ানোই আমার পক্ষে চরম নিষ্ঠুরতা হ’ত।

বাসুদেব বলিল—তোমায় অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এ অনুগ্রহ তোমার কাছে আমি চাই নি। আচ্ছা, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল। গোটা দুই কল্ আছে। এ বিষয়ে আর একদিন তোমার সঙ্গে কথা কইব। আজ চল্লাম।

বাড়ী ফিরিবার পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসুদেবের কথাগুলাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। যতই সবিতার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই এই কথাটাই প্রশ্নের মতো আমার কানে বাজিতে লাগিল—সত্যই ত, কেন তাহাকে এমন করিয়া দূরে

সরাইয়া দিতেছি? রূপ? গুণ? বংশ-মর্য্যাদা? প্রেম? কোনটার-ই অভাব তো তাহার মধ্যে নাই! তবে?

এই 'তবে'র উত্তরে একটি দিনের একটি ঘটনা মনে পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্লভবাবুর অত্যধিক বংশ-গরিমা আমার ভাল লাগিত না। তদুপরি সেদিন আমার একটি গ্রাম সম্পর্কে খুল্ল-তাতর কাছে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার সারা অন্তর আগুন হইয়া উঠিল। দুর্লভবাবু আমার সেই খুল্লতাতর নিকট অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া বলিয়াছেন যে, যদিচ কোন দিক দিয়াই তাঁহার জামাতা হইবার যোগ্যতা আমার নাই, তবুও তিনি যে আমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবেন মনস্থ করিয়াছেন, সে কেবল মাতৃহারা কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন বলিয়াই; নতুবা পাত্র-হিসাবে আমার অপেক্ষা অনেক সুপাত্র তাঁহার দ্বারে নিত্য নিয়মিত ধর্ণা দিতেছে।

মানুষের সকলের বড় তাহার আত্মসম্মান। তাহার উপর ঘা দিলে, মানুষ কী না করিতে পারে! সুতরাং এ-কথার পর সবিতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা ছাড়া, সবিতার প্রতি আমার মনের ভাব এমন কোন গভীর অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় নাই, যাহার জন্য অন্তরে বিশেষ বেদনা অনুভব করিব। তাহাকে আমার ভাল লাগিত। তাহার বেশী কিছু নয়। মেয়েটীর ভিতর এমন কোন বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল না, যাহার দ্বারা তাহার প্রতি আমার প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে।

চার

বলিলাম—আসা-যাওয়ার পথে দু'-বারই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! গাড়ী কোথায়?

সে বলিল—যাবার সময় তাড়াতাড়ি ছিল ব'লে গাড়ীতে উঠেছিলাম, এখন হেঁটে ফিরতে বেশ আরাম লাগছে।

তাহার পানে তাকাইয়া বলিলাম—এই পথের বাঁকে এমন সময় এই দেখা-হওয়াটি আমার অনেক দিন মনে থাক্‌বে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ!

সত্যই তাহাকে সেদিনের সেই রক্তিমাভ গোধূলী-সন্ধ্যায় অতিশয় সুন্দর এবং সজীব দেখাইতেছিল।

হাসিয়া বলিল—কী যে বলেন!

কথা ঘুরাইয়া বলিলাম—দু'হাত ভরে' ত জিনিষ নিয়েছ দেখছি। এত কেনা-কাটার ঘটা কেন?

আমার এই কথায় মল্লিকা কেন যে অতখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বাঃ, আপনি জানেন না বুঝি?

বলিলাম—না। কি জান্‌বো ?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে কহিল—আমার ত আর-কেউ নেই, কাজেই নিজেই সব করতে হয়। আপনি সত্যি জানেন না ?

বলিলাম—সত্যিই জানি না।

জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—আমার যে বিয়ে। ইহার অধিক কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

—অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ। কিন্তু কার সঙ্গে ? এক্‌লা এক্‌লা ত বিয়ে হয় না ?

মল্লিকা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—যান্‌। জানেন সব, অথচ—

বলিলাম—বিশ্বাস করো, কিছুই জানি না। বলো, কার সঙ্গে ? নাম না বলতে পারো, বুঝিয়ে দাও।

একটু হাসিয়া মল্লিকা যাহা আমাকে বুঝাইয়া দিল, তাহা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। এতখানি বিস্ময় এবং ক্ষোভ জীবনে বোধ করি আর কখনো অনুভব করি নাই। প্রথমে বলিবার মতো কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না ; শেষে কহিলাম—তিনকড়ি ! তুমি বিবাহ করবে তিনকড়িকে !! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ না কি ?

আমার কথা শুনিয়া মল্লিকা নিজেও অবাক হইয়া গিয়াছিল ; বলিল—না, ঠাট্টা ত নয়। আপনি ঠাট্টা বলে' মনে করছেন কেন ?

সহসা কেন যে এতখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম, তাহা নিজেই জানি না; বলিলাম—তুমি বিবাহ করবে তিনকড়িকে! এ-কথা তামাসা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মল্লিকা বিব্রত হইয়া পড়িল, বলিল—সত্যিই ঠাট্টা নয়। আপনি এত অবাক হয়ে গেছেন কেন, তা ত বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণের জন্য নিঃশব্দে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। এই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো কোমলাঙ্গী তরুণী মেয়েটির সহিত যতবারই সেই বিগত-যৌবন, স্থূলকায় তিনকড়িকে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম, ততবারই সেই ঘোর অসামঞ্জস্যের ছবি আমাকে নিদারুণ ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

মল্লিকা বলিল—তাঁর একটু বেশী বয়স হয়েছে বটে; কিন্তু তিনি খুব ভাল লোক এবং তাঁকে আমি বিশ্বাস করি।

বলিলাম—এই বিশ্বাস করাটাই কী পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো বস্তু মল্লিকা?

—নয়-ই বা কেন? তিনি আমায় সুখে রাখবেন! সে সংস্থান তাঁর আছে। (একটু থামিয়া) ভালবাসার কথা বলছেন? ও-সব বই-এর কথা। সংসারে কোন কাজে লাগে না। তাঁর যথেষ্ট পয়সা আছে, আমার কোন কষ্ট হবে না।

বলিলাম—এমন ঘোর সাংসারিক বুদ্ধি তুমি এরই মধ্যে কোথায় পেলে? আশ্চর্য্য ত!

মল্লিকা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আপনি খালি রাগ-ই করছেন!

কিন্তু কেন ? তাঁর বয়েস একটু বেশী হয়েছে বটে, আর দেখতে হয়ত তিনি সুন্দর নন ; কিন্তু তিনি আমার বাবাকে সারিয়ে তুলবেন বলেছেন ঃ—বলেছেন, ডাক্তারে যত টাকা চেয়েছে, সব তিনি দেবেন ।

মল্লিকা আরও কী বলিতে যাইতেছিল ; তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার বাবাকে সারিয়ে তোলবার জন্য কত টাকা তোমার চাই, দু'শো, পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার ? আমি তোমায় দিচ্ছি, এখুনি দেব । মল্লিকা, এ কী কাণ্ড করে' বসেছ তুমি !

তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, কখন আমার বাড়ীর পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছি তাহা খেয়াল হয় নাই । মুখ তুলিয়া দেখিলাম, অরীন্দ্রের বাগানবাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছি । দেখিলাম, তাহার বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলিতেছে । বলিলাম—আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও ; আমি একটু এখানটা ঘুরে তারপর বাড়ী ফিরব ।

মল্লিকা কিছু না বলিয়া নত মস্তকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেল ।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই অরীন্দ্র কলকণ্ঠে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিল ঃ

—কী শুভ মুহূর্ত্তেই এসেচো ; কার্ত্তিক, বিনায়কবাবুর জন্যে খাবার নিয়ে এসো।

তারপর সম্মুখে উপবিষ্ট দুইজন ভদ্রলোককে দেখাইয়া :

—এঁরা সব আজকে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়ে আমায় ধন্য করেচেন। নিশ্চয়ই এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

পরিচয় থাকুক আর নাই থাকুক, আর একবার নূতন করিয়া পরিচয় করিতে ক্ষতি কী ? ইনি চন্দনপুরের জমিদার—রাজীব-বাবু ? নমস্কার। নাম শুনেছি বৈকি ; কত বড় প্রসিদ্ধ লোক ! ও, আপনার আবাল্য বন্ধু। ইনি ? হ্যাঁ ! এঁকে ত বহুদিন থেকেই চিনি। আমার প্রণম্য। (মনে মনে কহিলাম, গুরুজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।)

বিস্মিত হইয়া গেলাম। যে দুর্লভবাবু কুমার-বাহাদুরের নামে বাড়ি মারিতেন, যিনি সুনীতি এবং সুরুচির আদর্শ শিক্ষকরূপে গ্রামে গ্রামান্তরে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন, কুমার-বাহাদুরের নিন্দা-বাদ অতি তীব্র ভাষায় যাঁহার কণ্ঠে অনুক্ষণ শুনিতে পাইতাম—সেই নীতিবাগীশ দুর্লভ রায়কে অরীন্দ্রের বৈঠকখানায় আসীন দেখিব, ইহা আমার সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। বোধ করি তিনি আমার বিস্ময়াপন্ন ভাব লক্ষ্য করিলেন ; বলিলেন—বৎসরের এই দিনটিতে আমি গ্রামের পরিচিত-অপরিচিত সবাইকার সঙ্গে দেখা করতে বেরুই। রাজীব বল্‌লে—চলো, কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে দেখা কোরে আসা যাক। তাই এলাম।

বেহারা আসিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া

গেল। আমি বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিলাম। ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছিল।

দুর্লভবাবু ছিন্ন-কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—যাই বলুন কুমার-বাহাদুর, এ কিন্তু আপনার অন্যায়। আমাদের কথা হ'লে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু আপনার মতো বিদ্বান, প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ অন্যায়।

চন্দনপুরের জমিদার-মহাশয় সশব্দে সায় দিলেন—নিশ্চয়। এ কথা আমিও স্বীকার করি।

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম—ব্যাপার কী? কিসের অন্যায়?

অরীন্দ্র উত্তর দিল—রায়-মশায় আমাকে বেশ একটি আইডিয়া দিয়েছেন। ওঁকে বলছিলাম যে, এ জায়গাটাতে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগচে না; কোন বৈচিত্র্য নেই—কেমন যেন নিরানন্দ ভাব—

রায়-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—উনি কম্‌প্লেন্‌ করছিলেন, এখানে আনন্দ নেই; বৈচিত্র্য নেই,—এক কথায়, স্থানটি অত্যন্ত ড্যাল্‌! বল্লাম—এ ত আপনারই দোষে কুমার বাহাদুর! হ্যাঁ, আপনারই দোষে; আপনি ইচ্ছে করলেই—আপনার জীবন আনন্দ-বৈচিত্র্যে পূর্ণ কোরে তুলতে পারেন.। সে ত একমাত্র আপনারই হাত।

প্রশ্ন করিলাম—কী আইডিয়া দিলেন ওকে?

—সে কিছুই না। আমি শুধু ওঁকেই দোষ দিলাম; এমন কোরে সবার আড়ালে একা একা যদি থাকেন, তা হ'লে ত নিরানন্দ বোধ হবেই। আপনার মতো শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোক যে কেমন কোরে এমন সন্ন্যাসী ফকিরের মতো সবার অগোচরে থাকতে পারে, সেই ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার! এ কী আপনার পক্ষে অন্যায় নয়? জীবনে যদি বৈচিত্র্য আনতে চান—গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোকদের নিমন্ত্রণ করুন, পার্টি দিন—

বাধা দিয়া বলিলাম—তাতে ফল কী হবে?

—এ আবার তুমি প্রশ্ন করছ? সে-রকম বন্ধু-সম্মেলনে কত লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হবে, বল দেখি? লোকের সঙ্গে পরিচয় না হলে মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে। আর সে সব করবার জন্য কুমার-বাহাদুরকে মোটেই ভাবতে হবে না; আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব। অর্থ এবং উপায় থাকতে উনি যদি স্বেচ্ছায় আনন্দহীন জীবন যাপন করেন ত কে কী করবে?

অরীন্দ্র বলিল—না, আপনি ঠিকই বলেছেন, এমন করে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না। শীগগিরই আমার এখানে একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে হবে। সত্যিই ত মানুষের সঙ্গে আলাপ না হলে প্রাণ বাঁচে না। রায়-মশায়, রাজীববাবু,—সে সময় আপনাদের শুধু উপস্থিত থাকাই নয়,—যা-কিছু আয়োজন সে-সব আপনাদেরই করতে হবে।

বলা বাহুল্য, দুই জনেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বার বার তাঁহাদের

উপস্থিতি এবং সাহায্যের কথা বলিয়া কুমার-বাহাদুরকে আশ্বস্ত করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা প্রস্থান করিলে.পর হাসিয়া বলিলাম—তা হলে কবে পার্টি দিচ্ছ? আমায় নিমন্ত্রণ করবে ত? যে উৎসাহ দেখছি, কি জানি হয়ত বা ভুলেই যাবে।

অরীন্দ্র আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া কী বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তিনকড়ি ঘরে ঢুকিল। তিনকড়িকে যেন আজ নূতন করিয়া দেখিলাম। একটি পরম পরিতৃপ্তির উচ্ছলতায় তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই চোখে তাহার সতেজ প্রাণের প্রাচুর্য্য। যৌবন তাহার যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

সসম্ভ্রমে মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—অনেকগুলো গরুর এক সঙ্গে অসুখ করেছে, হুজুর। কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার না আনালে বিশেষ সুবিধে হবে বলে বোধ হচ্ছে না।

অরীন্দ্র বলিল—আচ্ছা, কাল সকালে লিখে দেব।

বলিলাম—শুনে খুব খুসী হয়েছি, তিনকড়ি।

তিনকড়ি প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, বলিল—কিসের জন্য হুজুর?

বলিলাম—বুঝলে না। তোমার বিবাহের কথা বলছি।

অরীন্দ্র বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথাই বলেছ। (আমার গা টিপিয়া) কী হে, তোমায় সেদিনই বলেছিলাম না? তাই ত, তিন-

কড়ি, তলে তলে এত কাণ্ড করেছ, ঘুণাক্ষরে আমাদেরও ত জানাও নি? আচ্ছা চালাক লোক বটে তুমি! বসো, বসো, তিনকড়ি। বলছি, বোসো না। খাবে এক গ্লাস।

অরীন্দ্র আজ দিল-খোলসা হইয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; তিনকড়ির বারবার সানুনয় আপত্তিতে কর্ণপাত করিল না, জোর করিয়া তাহাকে আধ গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খাওইয়া দিল।

—তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর স্বাস্থ্যপান করছি হে, আজকালকার সভ্য-যুগে এই হচ্ছে নিয়ম।—এই বলিয়া নিজেও গ্লাস দুই নিঃশেষ করিল।

*

* *

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনকড়ি বক্তার হইয়া উঠিল। করজোড়ে কহিল—বেয়াদপি মাপ করবেন হুজুর, কিন্তু হুজুর (অর্থাৎ আমি) যখন কথাটা তুললেন, তখন প্রাণের কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করি। কী আনন্দ যে হচ্ছে, তা আপনাদের কি করে বোঝাবো! মনে হচ্ছে, স্বর্গেও এর চেয়ে বেশী সুখ নেই। আপনারাও যখন বিবাহ করবেন,—আপনারা কেন যে আজও বিবাহ করছেন না, হুজুরদের এ খেয়াল আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না। জীবন যে আপনাদের বৃথায় নষ্ট হচ্ছে, তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? বিবাহ জীবনের পরম পবিত্র বন্ধন। জীবনে শান্তি পেতে হ'লে—

বলিলাম—সেই জন্যেই বুঝি তুমি এই বয়সেও দ্বিতীয় বার সেই বন্ধন গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

কথাগুলোর মধ্যে জানি না কেন, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা শ্লেষ মিশিয়া গেল।

আমার কথা শুনিয়া তিনকড়ি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল; তারপর মিনতিপূর্ণ এবং লজ্জিত কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আপনার কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু আজ আমাকে তিরস্কার করবেন না। হয়ত এ আমার পক্ষে উচিত নয়,—কিন্তু মানুষ ত সব সময় লোভ সম্বরণ করতে পারে না। তবে একথা জান্‌বেন হুজুর, বুড়োই হই, আর কুৎসিতই হই, তাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি, চিরদিন ভালবাসবো। তাকে সুখী করবার জন্যে কোনদিন কোন চেষ্টার ত্রুটি কর্‌ব না। আমি যাই, মাথাটা বড্ড ঘুরছে। হুজুর, এমন করে আমায়—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনকড়ি আমার পানে করুণ নয়নে তাকাইয়া রহিল,—যেন কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পরক্ষণেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দুই জনেই সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলাম। ব্যাপার কী! ইহার মধ্যে কাঁদিবার কী আছে!

তিনকড়ি নিজের উচ্ছাসকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—বেয়াদপি মাপ করবেন হুজুর। কিছু হয় নি আমার। ওঁর শেষ-কথার পর হঠাৎ এক অজানা আশঙ্কায় মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ও কিছু নয়।

ধীরে ধীরে তিনকড়ি প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে আমিও উঠিয়া পড়িলাম। সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনকড়ির শেষ-কথা গুলো মনের মধ্যে আনা-গোনা করিতে লাগিল।

কে জানিত, তাহার মনের সেই আশঙ্কা এত শীঘ্রই সত্যে পরিণত হইবে?

পাঁচ

বেলা দ্বিপ্রহর। টেবিলের উপর স্তুপাকার কাগজ-পত্র ছড়ানো। তাহারই একখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নোট লিখিয়া দিতে-ছিলাম। তিন দিন ধরিয়া নিরবকাশ কাজের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

টেবিলের একধারে যে লাল-খামখানি রহিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মনের মধ্যে কী এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল ; সে কী দুঃখের, না বেদনার—তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইতেছিলাম না।

পরশু তিনকড়ির সহিত মল্লিকার বিবাহ হইয়া গেছে। অরী-ন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং অর্থানুকূল্যে বিবাহ বিশেষ সুশৃঙ্খলে এবং সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রামের সকল সম্ভ্রান্ত নর-নারীই বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রক্তরাঙা বেনারসী-সজ্জিত মল্লিকাকে সেদিন সে আসরে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইতে-ছিল।

মল্লিকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বেশী সে আর কী প্রত্যাশা করিতে পারে? তাহার মতো অবস্থার মেয়ের বিবাহে যে বিরাট ঘটা হইল, বড়লোকের কন্যার বিবাহেও ঠিক এতখানি হয় কি না সন্দেহ। মল্লিকা নিশ্চয় সুখী হইয়াছে।

কিন্তু মল্লিকা এ বিবাহে আনন্দে উৎফুল্ল হয় নাই। আর কেহ না বুঝুক, আমি তো বুঝি, বিবাহ-সভায় তাহার দুই চোখ যে অত ভারী দেখাইতেছিল, সে লজ্জায় নয়, বিষাদে। রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট দু'টি তাহার যে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তাহা কি আমি দেখি নাই? কী এক অনাগত দুঃখের আশঙ্কায় তাহার সারা দেহ যে ব্যাধ-ভীতা কপোতীর মতো শিহরিয়া উঠিতেছিল, তাহা আর কেহ না দেখুক, আমার চক্ষুকে ফাঁকী দিতে পারে নাই। এ বিবাহে মল্লিকা সুখী হয় নাই।

সেদিন রাত্রে কুমার-বাহাদুর ভোজের আয়োজন করিয়াছেন; অবশ্য মল্লিকা এবং তিনকড়ির শুভ-বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে এ-আয়োজন তাহা না বলিলেও চলে। গ্রামের পরিচিত এবং বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদেরই শুধু নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অল্পই।

একে একে সকলেই আসিতেছেন। সকলেই তিনকড়িকে অভি-

নন্দন জানাইতেছেন ; কেহ কেহ বা পরিহাসও করিতেছেন। তিনকড়ি শান্তমুখে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিতেছে।

অরীন্দ্রের স্ফূর্ত্তি আজ আর ধরে না। তিনকড়িকে লইয়া কত যে হাস্য-পরিহাস করিতেছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। এতটা বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের সহিত গল্প করিতেছিলাম।

নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে জনকয়েককে আপনারা চিনিবেন। দুর্লভ রায় ও তাঁহার সেই জমিদার বন্ধু। বাসুদেব ঘোষাল এবং রায়-দুহিতা সবিতা। ইঁহাদের নিশ্চয় চিনেন। আর একজনকে চিনিবেন ; তাঁহাকে আমি প্রথম দিন অরীন্দ্রের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম,—নাম শুনিলাম,—শঙ্কর চৌধুরী। লোকটাকে প্রথম হইতেই আমার ভালো লাগে নাই। সদাই কেমন যেন সন্দিগ্ধভাব। কেন যে এরূপ নিঃসঙ্কোচে সে অরীন্দ্রের স্কন্ধে ভর করিয়া দিব্য আরামে তাহার বাড়ীতে বসবাস করিত, তাহার সহিত অরীন্দ্রের সম্পর্কই বা কী—এই সব কথা যখন চিন্তা করিতাম, তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইত।

গান-বাজনার পর সকলে একত্রে আহার করিতে বসিলাম। সহসা অরীন্দ্র বলিয়া উঠিল—কিন্তু না, আমরা এমন-ভাবে খেতে পারি না। 'আজকের যিনি হোস্‌টেস্, তাঁর এখানে উপস্থিত থাকা চাই। কী বলেন আপনারা ?

সকলেই উচ্চকণ্ঠে তাহার কথা সমর্থন করিল।

অরীন্দ্র তিনকড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—তিনকড়ি, দেরী নয়। যাও, ডেকে নিয়ে এসো।

তিনকড়ি বিব্রত হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

অরীন্দ্র তিনকড়িকে তাড়া দিয়া উঠিল। মল্লিকা সেখানে উপস্থিত না থাকিলে কেহই আহার করিবে না।

তিনকড়ি তখন আমার কাছে সরিয়া আসিয়া, অন্যে শুনিতে না পায়, এরূপ নিম্নকণ্ঠে বলিল—দয়া কোরে আমায় সাহায্য করুন। আমি ডাকতে গেলে ও কিছুতেই আসবে না। কী জানি, সকাল থেকে ওর কী হয়েছে? আপনি যদি গিয়ে ডাকেন, তা হলে হয়ত আসতে পারে।

তিনকড়ির বিলম্ব দেখিয়া সকলে তাহাকে পুনঃপুনঃ তাগাদা দিতেছিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—তিনকড়ির কাছ থেকে একটি মধুর কাজের ভার পেয়েছি। আপনারা আরম্ভ কোরে দিন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে আসছি।

ঘর হইতে বাহির হইয়া, এ-ঘর ও-ঘর অন্বেষণ করিয়া একটি পরিচারিকার মুখে শুনিলাম, মল্লিকা বাগানের ভিতর গিয়াছে।

বাগানের মধ্যভাগে লতা-পাতা-ঘেরা একটি বিরাম-কুঞ্জ আছে; দেখিলাম, মল্লিকা তাহারই ভিতরে একটি শিলাসনে বসিয়া রহিয়াছে। মাথাটি তাহার হেলিয়া পড়িয়া একটি গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় করিয়াছে। চোখ দু'টী মুদ্রিত। ভিতরে প্রবেশ করিবা-

মাত্র সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া বিস্রস্ত গাত্র-বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল।

দেখিলাম, মল্লিকার সারা দেহে যেন একটি সীমাহীন শ্রান্তি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। অমন যে তাহার সদা-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু, তাহারা যেন আজ আষাঢ়ের মেঘলা দিনের মতোই ম্লান এবং ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মল্লিকার হইয়াছে কী?

তাহার কাছে গিয়া বলিলাম—তা হবে না। আমরা ওখানে, আর তুমি যে এখানে এমন কোরে লুকিয়ে থাকবে—এ তোমার ভারী অন্যায়। চল, আমরা সব খেতে বসেছি, অতিথি-সৎকার ঠিক-মতো হচ্ছে কি না, তার তদারক করবার জন্য তোমার ডাক পড়েছে। ওঠ।

মল্লিকা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—না, আমি যাব না।

আশ্চর্য্য হইলাম; বলিলাম—কেন যাবে না মল্লিকা?

সে কথার কোন উত্তর পাইলাম না। দেখিলাম, সহসা মল্লিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বলিল—এ আমি কী করলাম! কেন আমি এমন কাজ করলাম!

নিমেষে আমার চোখের সুমুখের অস্পষ্টতার অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। মল্লিকার ওই একটি মাত্র কথায় সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ বোধ হইল।

বলিলাম—হ্যাঁ। এ তুমি কী করলে? কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফিরবে না, মল্লিকা। এখন দুঃখ কোরে আর কী ফল হবে বল?

—কেন আমি ওকে বিবাহ করলাম? আমার সব বুদ্ধি এমন কোরে কে হরণ কোরে নিলে?

—সে প্রশ্ন কর তোমার ভগবানকে। এখন ওঠ, ওখানে ওরা সবাই তোমার উপস্থিতি কামনা করচে।

মল্লিকা উঠিল না। তেমনি আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল —একটু আগে কেন বুঝেও বুঝলাম না? তা হ'লে তো তাঁর কাছেই নিজেকে অর্পণ করতে পারতাম।

—কে সে, মল্লিকা?

—যিনি আমায় ভালোবাসেন, যাঁকে আমি ভালোবাসি। যাঁকে আমি মনে মনে কত দিন কত রাত কল্পনা করেছি,—কিন্তু যাঁকে আমি সাহস কোরে কোনদিন সত্যিকার ব'লে ভাবতে পারি নি—তাঁকে?

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। নারীর মুখ হইতে এই স্বীকারোক্তি শুনিবার লোভ কে কবে সম্বরণ করিতে পারিয়াছে? ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলাম—কে সে?

কে? মল্লিকা তাহার দুই চোখ আমার পানে তুলিয়া ধরিল। অনির্ব্বচনীয় সে দৃষ্টি! এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। মনে হইল—তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের উপর আসিয়া জমা হইতেছে। মুহূর্ত্ত-কাল পরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—আপনি। হ্যাঁ আপনিই। আমার সমস্ত দিন-রাত্রির ধ্যান, সে তো আপনাকে কল্পনা করেই। কতদিন—

বলিলাম—আচ্ছা, শুনেছি। এখন ওঠ, চোখ মুছে ফেল। ওখানে ওঁরা তোমায় খুঁজছেন।

এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলাম। আমার স্পর্শ পাইয়া মল্লিকা খানিকটা যেন সজীব হইয়া উঠিল। বলিল—খুঁজুক। আমি যেতে চাই নে।

তারপর আমার হাতের উপর ভর দিয়া বলিল—জীবন আমার নষ্ট হয়ে গেল। এ জীবনে আর কিছুই আমার কামনা করবার নেই। শুধু আপনি বলুন,—আমায় ভালবাসেন!

এ কী ভয়ঙ্কর অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলাম! এই নিরালা জনশূন্য কুঞ্জবন আর দেহের উপর আমার প্রস্ফূট-যৌবনা কোমলাঙ্গী তরুণীর দেহ এলায়িত—জীবনে এমন ক্ষণ মানুষের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম—এখন আমাদের যেতে হবে, মল্লিকা। ওঁরা হয়ত আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন।

মৃতুল লতার মতো আমার বক্ষ সংলগ্ন হইয়া অস্ফুট কণ্ঠে মল্লিকা বলিল—হোক্ গে। বলুন আপনি।

ইহার পর আর নিজেকে সংযমের বাঁধনে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি নাই। দুই হাতে তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, তাহার নরম ওষ্ঠাধরে আপনার ওষ্ঠের উত্তপ্ত আলিঙ্গন আঁকিয়া দিয়া বলিলাম—বাসি, মল্লিকা। তোমায় সত্যিই ভালোবাসি।

মল্লিকা তদবস্থায় থাকিয়া একটি মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—জীবনে আর আমার কোন দুঃখ নেই। মনে হচ্ছে, এখন যদি মৃত্যু আসে, সে আসবে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো, বলুন, আমায় ছেড়ে যাবেন না?

বলিলাম—তোমায় ছেড়ে যেদিন যাব, সেদিন যেন এ-প্রাণও আমার দেহ থেকে ছেড়ে যায়। কিন্তু কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ছাড় তো, দেখি।

আমার কথা শেষ হইবার আগেই দেখিলাম, দরজার মুখে সেই ক্রূর শঙ্কর চৌধুরী দাঁড়াইয়া আছে। আমার সহিত চোখো-চোখী হইতেই ঠোঁটের ফাঁকে স্বল্প একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—অনেকক্ষণ এসেছি, কিন্তু পাছে আপনাদের বিশ্রম্ভালাপের ব্যাঘাত ঘটে, তাই ডাকতে সাহস করি নি।

মনের ক্রুদ্ধ ভাব দমন করিয়া বলিলাম—তাই না কি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

ছয়

খাওয়া-দাওয়ার পর অরীন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমার উত্তেজিতভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। বলিল—কী কথা, বল।

—আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও। হয় আমাকে, না হয়, ওই শঙ্কর চৌধুরীকে। হয় ওকে এখনি তোমার বাড়ী থেকে বের করে দাও এবং ব'লে দাও, ভবিষ্যতে যেন আর কোনদিন তোমার বাড়ী না ঢোকে; না হয় আমি এখনি তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এবং বলে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তোমার বাড়ী ঢুকবো না।

আমার কথা শুনিয়া অরীন্দ্রের মুখ হইতে সিগারেট মাটিতে পড়িয়া গেল। বলিল—ব্যাপার কি বিনু? পাগল হয়ে গেলে না কি?

—বাজে কথা রাখো। তোমার ওই স্কাউন্‌ড্রেল্, স্পাই, বদ্-

মাস বন্ধু শঙ্কর চৌধুরীকে আমি আর এক মুহূর্ত্তও আমার সামনে দেখতে চাই না। আমাকে যদি তোমার বন্ধু ব'লে স্বীকার করো, তাড়াও ওকে এই মুহূর্ত্তে।

—কিন্তু ও তোমার করেছে কী?

—আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে চাও, না, তাকে?

—কিন্তু এ তো তুমি আমায় মহা সমস্যার মধ্যে ফেল্‌ছো ভাই। এ যে আমার পক্ষে অসম্ভব।

—বেশ, তোমার সঙ্গে আর আমার পরিচয় নেই। গুড্ বাই।

অরীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কী যেন বলিতে লাগিল, তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তিন দিন ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইলাম; কিছুতেই বাড়ীর বাহির হইলাম না। কাজ কর্ম্ম পড়িয়া রহিল। লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল; তাহাদের ফিরাইয়া দিলাম। সদানন্দ বিনা কারণে ধমক খাইয়া সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

অরীন্দ্রের বাড়ী যাইব না—এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তিন

দিন ধরিয়া যে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাইতে হইল, তাহার পীড়নও বড় কম নহে।

অরীন্দ্রের কথা ভাবিতে গিয়া আর একজনকে মনে পড়িল। সে মল্লিকা! যদি আমার মধ্যে শুচিতা বলিয়া মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন জিনিষ আজো বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ছেদন করাই উচিৎ। সেদিন মূহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা বশে তাহার সহিত যে কাণ্ড করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহার জের টানিবার চেষ্টা করিলে—দুইজনেই অনতিবিলম্বে রসাতলে গিয়া উপস্থিত হইবে। তিনকড়িকে বিবাহ করিয়া মল্লিকা ভুল করিয়াছে। তারও চেয়ে ভুল করিয়াছে সে আমাকে ভালোবাসিয়া। এবং সে যদি এখন তাহার সেই অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহাকে লোকে কী বলিয়া অভিহিত করিবে? না, কিছুতেই আর আমার মল্লিকার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য নয়। কিছুতেই না।

কিন্তু তবুও আমার সকল সত্তা তাহার প্রতি কী এক দুর্ণিবার আকর্ষণে সদা-সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া আছে। হ্যাঁ, তাহাকে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। যখনই সেদিনের সেই কুঞ্জবনের স্মৃতি আমার মনে পড়িতেছে, তখনই আমার সারা প্রাণ উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে। তেমনি-তর আর একটি মিলনের জন্য আমার অন্তর ক্ষণে ক্ষণে তৃষিত হইয়া উঠিতেছে।

অরীন্দ্র আমায় পত্রের পর পত্র পাঠাইয়াছে। আমার ক্ষমা

প্রার্থনা করিয়াছে। আমাকে তাহার বাড়ী আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কাতর অনুনয় জানাইয়াছে। তাহার কোন পত্রের উত্তর দিই নাই।

সেদিন ঘরের মধ্যে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় পিছনে কাহার লঘু পদধ্বনি শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, মল্লিকা ঘরে প্রবেশ করিতেছে। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—তুমি? আমার বাড়ীতে? কী সাহস তোমার!

সে বলিল—হ্যাঁ আমি। তাড়িয়ে দেবেন না কি?

তিনদিন ধরিয়া মনের মধ্যে যে অবসাদ অনুভব করিতেছিলাম, মল্লিকাকে পাইয়া এক নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইল। মনে হইল যেন, এই মুহূর্ত্তে আমার মতো সুখী ব্যক্তি বোধ করি আকাশের নীচে আর একজনও নাই। পরম সমাদরে তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মল্লিকা বলিয়া উঠিল—আপনার বাড়ীটি তো ভারী ছোট্ট! ঘরটিও তাই! এত পয়সা রোজগার করেন, অথচ এমন গরীবের মতো থাকেন কেন?

দারিদ্র্য মল্লিকা সহ্য করিতে পারে না। জন্মাবধি বিলাসিতা

এবং ঐশ্বর্য্যকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ভোগপিপাসু অন্তরের এই বিলাস-পরায়ণতা তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় লইয়া গেল, তাহা যদি সে আগে বুঝিতে পারিত!

বলিলাম—সবাই তো কুমার বাহাদুর নয়। যে যেমন। সে কথা থাক্। এখন কী মনে ক'রে এ গরীবের ঘরে এলে, তাই বল।

মল্লিকা বলিল—এক্ষুণি আমায় যেতে হবে। গয়লা-বাড়ী যাচ্ছি ব'লে এখানে এসেছি। তিন দিন ধ'রে আমাদের বাড়ী যান নি কেন, তাই বলুন।

বলিলাম—শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। ভয় কী! আমি তোমারই আছি।

মল্লিকা রক্তিম হইয়া উঠিল। অস্ফুটে কী বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল:

"খুন করেছে; মেয়েটাকে একেবারে খুন করেছে! পুলিস ডাকো। পুলিস, পুলিস।"

মল্লিকা শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে আমার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। তাহার ভীত জিজ্ঞাসু-মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম—ও কিছু নয়। আমার ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটা পাগল আছে। সে-ই যখন-তখন অমনি কো'রে চেঁচায়। ভয় পেয়ে গেছ?

—ভয় পাবো না? মা গো! এখনো আমার বুক কাঁপছে। আমি যাই।

—এখুনি যাবে কী? এই তো এলে···

—না না, আমি যাই। আপনি যাবেন আমাদের বাড়ী। ঠিক যাবেন। চল্লাম।

দরজার কাছ অবধি গিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছি, দেখি, ঘরের মধ্যে গম্ভীর মুখে সদানন্দ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে বাকী রহিল না; হাসিয়া বলিলাম—খবর কী?

সদানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু মোটেই ভালো নয়। ছি ছি! শেষ কালে বাড়ীর মধ্যেই? এ কিন্তু চলবে না। ফের যদি ওই মেয়েটাকে এখানে দেখি, তা হ'লে আমায় দেশে গিয়ে কর্ত্তাকে খবর দিতে হবে, তা ব'লে রাখছি।

হাসিয়া বলিলাম—আচ্ছা, দিস খবর। যা, এখন নিজের কাজে যা।

সদানন্দ বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে প্রস্থান করিল।

বিছানার উপর গা এলাইয়া দিয়া একখানা আইনের কেতাব লইয়া শুইয়া পড়িলাম। কয়েক পাতা পড়িয়াছি, এমন সময় দ্বারের মুখে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাইলাম। পরক্ষণেই অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ:—"বিনু আছে ওপরে?"

—আছেন বৈকি; (এ সদানন্দের গলা) যান, ওপরে যান।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিছানার কাছে আসিয়া নম্র কণ্ঠে অরীন্দ্র ডাকিল—বিনু, ঘুমুচ্ছ ?

ইহার পরে আর ঘুমানো সম্ভব নয়। উঠিয়া বসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম।

অরীন্দ্র বিছানার উপর বসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া ছলছল চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল—বিনু! কি করেছি আমি, যে তুমি আমায় এমন ক'রে ত্যাগ করছ ?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—না, না ; ত্যাগ করব কেন।

—করছ না ত কী! আজ তিন দিন হয়ে গেল, কতবার ক'রে তোমায় ডাকতে পাঠালাম—তুমি কিছুতেই গেলে না। তোমায় আমি কত ভালোবাসি, কত শ্রদ্ধা করি—আর তুমি আমায় এমনি ক'রে—

তাহাকে থামাইয়া তাহার দুই হাত নাড়িয়া দিয়া বলিলাম—বাস্। আর বলতে হবে না। এস, এখনি তোমার বাড়ী যাচ্ছি।

অরীন্দ্র আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার আনন্দ জ্ঞাপন করিল। সত্যই, তাহাকে ব্যথা দিয়া কোন গর্ব্ব অনুভব করা যায় না, এমনি দুর্ব্বল সে।

—তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। বাইরে গাড়ীতে বসে আছে। বল, তাকে ডেকে আনি, সে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক।

বলিলাম—শঙ্কর কী অন্যায় করেছে, তুমি জান ?

—না।

—ভালোই। তাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। এমনিই তাকে এ-যাত্রা রেহাই দিলাম। কিন্তু তাকে ভবিষ্যতে সাবধান হতে বলে দিও।

—নিশ্চয় বলে দেব। যাক, তোমাকে যে এমন খোস-মেজাজে দেখবো, আশা করি নি। হ্যাঁ, ভালো কথা, পথে আসতে আসতে মল্লিকাকে দেখলাম। আমায় দেখে হাস্‌লো। দেখ বিনু, তিনকড়িকে আমার মোটেই ভালো লাগে না! মল্লিকা যে তার স্ত্রী—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না।

তারপর নিম্নস্বরে মল্লিকার সম্বন্ধে তাহার সত্যকার মতামত এবং অভিসন্ধির কথা আমার কাছে সবিস্তারে প্রকাশ করিল।

তার সহিত ইহার ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের কথা আলোচনা করা বৃথা। তাই তাহার নির্লজ্জ উক্তির উত্তরে মৌন হইয়াই রহিলাম।

মল্লিকার কথা শেষ করিয়া অরীন্দ্র বলিল—এখানকার মেয়েদের মধ্যে আর-কাকে আমার ভাল লাগে, জানো? সবিতা। চমৎকার মেয়ে! ইচ্ছে করে, ওর ওই ঢুলু ঢুলু চোখ-দু'টার দিকে রাত্রি-দিন চেয়ে থাকি। ওখানেও চার্ ফেলেছি,—দেখি কী হয়। মনে করছি, শীগ্‌গিরই একটা পার্টি দেব, আর তাতে ওকে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করব। দেখা যাক, কতদূর কী হয়। আচ্ছা, তা হ'লে চল্লাম। আসছো সন্ধ্যের সময়? ঠিক, ভুলো না কিন্তু—

সাত

শরৎ কাল শেষ হইয়া আসিতেছে। ভোরের আকাশে কুয়াসার আভাস দেখা দিয়াছে। মনে হয়, এবার সময়ের পূর্ব্বেই শীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

এমনি দিনের এক পরিণাম-রমণীয় সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। দিন দুই ধরিয়া শরীর খারাপ থাকায় ঘরে বন্ধ হইয়াছিলাম,—সেদিন গোধূলীর রক্তিম সন্ধ্যায় একাকী ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া মনে হইতেছিল যেন কত যুগ পরে এই প্রথম চারিদিকে আমার প্রকৃতির অপরূপ শোভা এমনি করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দেহে এবং মনে প্রশান্ত একটি সুস্থতা অনুভব করিতেছিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে তিনকড়ির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—বাড়ীর সম্মুখে যে ছোট্ট বাগানটুকু আছে, সেইখানে তিনকড়ির ছোট ছেলেটি খেলা করিতেছে। ওদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দূরে একটা উঁচু সিঁড়ির উপর তিনকড়ি বসিয়া আছে—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া। প্রথমটা সে আমাকে দেখিতে পাইল না।

ছেলেটির কাছে গিয়া প্রশ্ন করিলাম—খোকা, তোমার নতুন-মা কোথায় ?

খোকা খেলা ভুলিয়া আমার পানে তাহার দুই ডাগর চক্ষু মেলিয়া ধরিল ; তাহার পর সসম্ভ্রমে বলিল—মা কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন। রোজ-ই এমনি সময় যান।

তিনকড়ি দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল ; আমার বিস্মিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল—হুজুর দেখছি, অবাক্ হয়ে গেছেন !

তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম—না, অবাক্ হয়ে যাব কেন ? বেড়াতে গেছে, তাতে আর দোষ কী ?

তিনকড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিও তো ওই ব'লেই মনকে প্রবোধ দিই।

তিনকড়ির সেই বেদনা-বিক্ষুব্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে অনেক অব্যক্ত কথাই যেন শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, এরূপ ক্ষেত্রে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিতে সুরু করিয়াছে। ইহার জন্য দোষ দিব কাহাকে ?

সন্ধ্যা হইবার কিছুক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল। একান্তে

পাইয়া অরীন্দ্র আমার কাণে কাণে বলিল—আমাকে তুমি কন্‌-গ্র্যাচুলেট্‌ করতে পারো।

—কেন ?

—আর কেন ! আর দিন-দুই এমনি করে একা একা বেড়াতে যাওয়া—বাস্‌, কেল্লা ফতে ! এখন চল, বাড়ীতে জন-দুই বন্ধু লোক বসে আছে ; আর তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথাও আছে। শুনলাম, সবিতার সম্বন্ধে তোমার না কি কিছু দুর্ব্বলতা আছে ?

বলিলাম—কে বল্লে ?

—শুনলাম। তা যদি থাকে, তা হলে আমি সরে' দাঁড়াই। অপরের কাজে আমি নাক্‌ ঢোকাতে চাই নে। বিশেষ, এ ক্ষেত্রে যখন তুমি। অবশ্য, তোমার যদি কোন রকম অভিসন্ধি না থাকে—

অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতেছিল, বলিলাম—না, আমার কোন কিছু ইচ্ছে নেই।

আমার কথা শুনিয়া অরীন্দ্র সহর্ষে এবং সবিস্তারে, কেমন করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা যায়, তাহারই অব্যর্থ ফন্দীর কথা বলিয়া চলিল। কী অপরিমিত উৎসাহ ! কী অদম্য সাহস !!

আট

ইহার পর ঘটনার স্রোত অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বহিয়া চলিল। জল ঘুলাইয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং দিনের পর দিন সেই স্রোতের মুখে যাহারা ভাসিয়া চলিল, কোথায় গিয়া, কেমন করিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য মোহানায় তাহাদের এই উদ্দাম যাত্রা শেষ হইবে, তাহার কোন নিশ্চিৎ নির্ণয় রহিল না। নিজে তাহাদের সহিত এমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছিলাম যে, শত ইচ্ছাসত্ত্বেও সেই কর্দ্দম-ক্লিন্ন স্রোতের মুখ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইতে পারিতেছিলাম না। তাহাদেরই একজন হইয়া আমিও ভাসিয়া চলিলাম।

লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, মল্লিকা আমার কাছ হইতে দূরে থাকিতে চায়। সময় সময় তাহাকে যে কাছে পাই না এমন

নয়,—কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তেমন মনে-প্রাণে একান্ত করিয়া পাই না। কোথায় কী যেন একটু আড়াল গড়িয়া উঠিয়াছে।

সবিতার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। কথাবার্ত্তাও চলে। কিন্তু সে আলাপের মধ্যে নৈকট্য অপেক্ষা দূরত্বের সুরই যেন অধিকতর প্রকাশিত হয়। সবিতা আমার দিক্ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে।

সময় এবং সুযোগ পাইলেই অরীন্দ্র সবিতার স্তাবকতা করে। হয়ত তাহা সবিতার ভালোই লাগে। দুর্লভবাবু প্রসন্নচিত্তে তাহাদের লক্ষ্য করেন। প্রসন্ন মুখের উপর তাঁহার মনের যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা আমি অতি সহজেই বুঝিতে পারি। এবং ইহা তো স্বাভাবিক। অমন বিপুল বিত্তশালী জামাতার জন্য কে আর না উৎসুক হয়? ভাবে বোধ হয়, আমাকে তিনি আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।

তিনকড়ি দিন দিন যেন অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বেকার তাহার সে শান্ত নম্র আকৃতি আর নাই। মুখের উপর বিষাদ-এর ছায়া এবং তাহার সহিত একটি অত্যুগ্র জ্বালা যেন

অনুক্ষণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। তিনকড়ির ভিতরটা যে দিনের পর দিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম। সেই পুঞ্জীভূত ক্রোধ যেদিন ফাটিয়া পড়িবে, সেদিন কী যে হইবে তাহা একমাত্র ভগবান-ই জানেন।

সেদিন তিনকড়ির ছেলের মুখে শুনিলাম, আগের দিন রাত্রে পিতা-মাতায় বিষম কলহ হইয়াছিল, মাতা রাগ করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তিনকড়িকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তাহাকেই প্রশ্ন করিলাম। প্রশ্ন শুনিয়া তিনকড়ি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল ; তারপর যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া শীর্ণ হইয়া উঠিলাম। স্বামী না হয় রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলই, কিন্তু তাই বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া তাহারই চোখের সুমুখে পর-পুরুষের গৃহে রাত্রি-যাপন করা—এ মল্লিকা কোথায় নামিয়া গিয়াছে ? অরীন্দ্রকে কী বলিব ? পশু সে, এমনি সুযোগই তো সে খুঁজিতেছিল। তাহার কথা ছাড়িয়া দিই। কিন্তু মল্লিকা ? তাহার প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

স্পষ্ট মনে আছে, সে রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই। বিক্ষুব্ধ অন্তরে নিরন্তর মল্লিকার কথাই চিন্তা করিয়াছি। পাশের বাড়ীর পাগলটার পাগলামী রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে ; থাকিয়া থাকিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—

"খুন করেছে, মেয়েটাকে একেবারে খুন করেছে; পুলিস ডাকো; পুলিস।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সেই ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখ আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল……

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে শুনিলাম, রাত্রে বুঝি তিনকড়ি মল্লিকার ব্যবহারে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া তাহার গায়ে হাত উঠাইয়াছিল; মল্লিকা কাঁদিয়া-কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া অরীন্দ্রের কাছে সে কথা নালিশ করে। কুমার-বাহাদুর মহিলার প্রতি এরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন নাই। সে-কথা শ্রবণমাত্রই সপুত্র তিনকড়িকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। শোনা গেল, গ্রামান্তরের এক তাড়ির দোকানে বসিয়া তিনকড়ি অষ্টপ্রহর ধরিয়া তাড়ি সেবনে নিমগ্ন আছে; ছেলেটা কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছে।

অতঃপর অরীন্দ্র এবং মল্লিকা নিষ্কণ্টকে তাহাদের বাধাবন্ধহীন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিল।

নয়

শীতের মধুর মধ্যাহ্ন।

অরীন্দ্রের বাগানে সেদিন এক বিরাট পিক্‌নিক্‌-এর আয়োজন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বাবুর্চ্চি আসিয়াছে, পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে, তরি-তরকারি আসিয়াছে এবং তাহারি সহিত আসিয়াছে কেল্‌নার-এর বাড়ী হইতে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য পানীয়। তাহাদের অবশ্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে কুমার-বাহাদুরের খাস-চাকর কার্ত্তিক-এর হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো মেয়েদের নানাপ্রকার ফ্যাসান-সম্মত রঙীন সাড়ীর শোভা বাগান-এর গাছ-পালাগুলিকে পর্য্যন্ত যেন প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল।

চন্দনপুরের জমিদার রাজীবাবুর স্ত্রী এবং কন্যার সহিত পরিচয় হইল। ন্যূনকল্পে সওয়া-তিন-মন ওজনের জমিদার-গৃহিণীর অঙ্গে অলঙ্কারের ওজনও বড় কম হইবে না ; দেহ এবং অলঙ্কারের অনু-পাতে তাঁহার বাচন-ভঙ্গীও তেমনি ভারী। কিছুক্ষণ কথা কহিয়াই হাঁপাইয়া উঠিলাম।

লনের একধারে একটি 'বাওয়ার'-এর তলায় সবিতা একা বসিয়া আছে। তাহার প্রসাধনের পরিপাট্য আজ যেন কিছু অতি-রিক্ত বলিয়া মনে হইল। বসিয়া থাকার ভঙ্গীটি তাহার অত্যন্ত উদাস।

ওধারে চাহিয়া দেখিলাম—মল্লিকা (নীল সাটিনের সাড়ী এবং নিম্নবক্ষ ব্লাউজের শোভায় তাহাকে তরল সুরার মতোই অপরূপ দেখাইতেছে) দীর্ঘিকার তীরে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছে।

সবিতা কখন উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে, লক্ষ্য করি নাই ; সহসা তাহার মৃদু কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল ; বলিলাম—আমাকে কিছু বলছিলে ?

সবিতা স্বভাবতই মৃদুভাষিণী ; বলিল—না, বিশেষ কিছু নয়। একা বসে থাকতে ভালো লাগ্‌ছিল না ; আপনাকে দেখে উঠে

এলাম। এঁরা সব কোথায় গেলেন? আপনি এত তন্ময় হয়ে কী দেখ্‌ছেন?

এঁরা অর্থে সবিতা কাহাকে নির্দেশ করিল, তাহা বুঝিতে আমার একতিলও বিলম্ব হইল না। বলিলাম—হয়ত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে ভিতরে আছেন। আমি একমনে কী দেখছিলাম, জানো?—ঐ মেয়েটিকে? কী অদ্ভুত ওর জীবন!

সবিতা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওর কথা বলবেন না। ওর মত ভীষণ খারাপ মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখি নি। ওকে দেখ্‌লেই আমার ঘৃণা বোধ হয়। আচ্ছা, ওর স্বামীর কি হয়েছে, জানেন?

—জানি। সে আছে ভিন্‌-গাঁয়ে এবং সেখানে এক তাড়ির দোকানে বসে অষ্টপ্রহর মদ খাচ্ছে।

—দেখুন তো! আজ যে তার এই অবস্থা, সে তো ওরই জন্যে। বাবাও তাকে একদিন দেখেছিলেন। কুমার-বাহাদুর কেমন ভাল লোক, শুনুন—বাবার কাছে শুনেই তাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর বেশী তিনি আর কি করবেন? অমন হতচ্ছাড়া লোককে তো আর কাজে রাখতে পারেন না।

বলিলাম—তা তো বটেই। হ্যাঁ, অরীন্দ্রের মতো ভাল ছেলে আজকালকার বাজারে মেলে না। কিন্তু তবুও সবিতা, একটা কথা আজ তোমায় প্রশ্ন না করে পাচ্ছি নে; লোকে যে বলে, তুমি আজকাল অরীন্দ্রের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছো—এ কথা কী সত্যি?

সবিতা উত্তর দিল—হ্যাঁ, সত্যি। মানুষের সঙ্গে মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবে—তাতে দোষ কী?

—দোষের কথা বলছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো, গ্রামের লোকে অরীন্দ্রের নামে যা তা অপবাদ দেয়। বলে—তার মতো দুশ্চরিত্র লোক নাকি এ গ্রামে আর কখনো আসে নি। এসব কথা তুমি কী জানো না?

শান্তকণ্ঠে সবিতা উত্তর করিল—হ্যাঁ, জানি। কিন্তু সে-সব একেবারে মিথ্যে। তারা ওঁকে জানে না, তাই ও-সব কথা বলে। তারা মানুষের ভালো-দিক্‌টা দেখতে পায়না, এমনি অন্ধ তারা।

—তুমি দেখেছ তার ভাল দিক?

—নিশ্চয় দেখেছি? তা না হলে এবং তাঁর সদভিপ্রায় বুঝতে না পারলে কখনো তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তাম্ না।

ও হোঃ! তোমার প্রতি তাহার অভিপ্রায় যে সৎ, তাহা অবধি যখন বুঝিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমার মুক্তির আর বিলম্ব নাই। হাসিয়া বলিলাম—বটে! তা হলে অনেকদূর এগিয়েছ দেখছি?

—হ্যাঁ। আজ আপনাকে এ কথা বল্‌তে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই যে, তিনি যদি আমায় বিবাহ করতে চান, আমি না বল্‌ব না। আপনি আশ্চর্য্য হবেন না; এ-বিবাহে আমি সুখীই হব। দোষ থাকলেও তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে; এবং সেই-মানুষকেই আমি জাগিয়ে তুল্‌ব; আমার স্পর্শে তাঁর ভিতরকার যা কিছু অশুচি সব যাবে ধুয়ে; তিনি এ জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে আপনার পরিচয় দেবেন।

দেখিলাম, অন্তরোচ্ছ্বাসে তরুণী মেয়েটি আজ কবি হইয়া উঠিয়াছে ; যুক্তি দিয়া ইহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। সে এখন উদ্দীপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চিরদিনের এই সল্পবাক্ মেয়েটি যে আজ এতখানি প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত ইহা আমার পক্ষ হইতে প্রত্যাখান-জনিত প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে। সবিতাকে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ও-ধার হইতে আমার ডাক আসিল। চিন্তাগ্রস্থ হৃদয়ে আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

কয়েকটা পাখী শিকার করা হইয়াছিল। মৃত এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সেগুলি দীঘির পাড়ে পড়িয়াছিল। যেগুলা মরিয়া বাঁচিয়াছিল তাহাদের জন্য নহে, ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিয়া যাহারা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রনায় অনুক্ষণ মৃত্যুকে কামনা করিতেছিল, সেই দুর্ব্বল রক্তাপ্লুত পক্ষী-শিশুগুলিকে দেখিয়া সত্যই দুঃখ হয়। দূর হইতে দেখিলাম, মল্লিকা সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাদের দেখিতেছে।

তাহার কাছে গিয়া বলিলাম—ওই অসহায় কোমল জীবগুলিকে এমন আধমরা অবস্থায় রেখে দেওয়ার চেয়ে নিষ্ঠুরতা বুঝি আর কিছুই নেই। কিন্তু নারী হয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে তুমি ওদের যন্ত্রনা দেখছো কেমন ক'রে? তোমার মায়া লাগছে না?

মল্লিকা আমার পানে চাহিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল—অন্য অনেকেই যখন পৃথিবীতে যন্ত্রণা সহ্য করছে, তখন ওরাও করুক।

—অন্য আবার কে যন্ত্রনা সহ্য করছে গো ?

—আজ আমাকে রেহাই দিন। আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে আজ আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

তাহার দুই চোখে একই সঙ্গে একটি উগ্র জ্বালা এবং সজল ছায়া লক্ষ্য করিলাম। তাহার ডালিম-ফুলের মতো রাঙ্গা ঠোঁট দু'টি সাদা হইয়া গেছে ; চোখের পাতা কাঁপিতেছে।

শ্লেষ করিয়া বলিলাম—তাই না কি, ভাল লাগছে না ? এত দিনের এত প্রণয়, সব এরই মধ্যে উবে গেল না কি, মল্লিকা ?

—আপনি যান, যান বল্‌ছি এখান থেকে !

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার মনোহারিকার অবস্থা দেখে বড্ড চিন্তান্বিত হচ্ছি যে ! কী হয়েছে তোমার ?

—কিছুই হয় নি। আমি দুশ্চরিত্রা, আমি—। আপনি আমাকে তাই মনে করেন ; আমি জানি। বেশ তো, যান, যে-সব সাধু-পুরুষ আছে, তাদের কাছেই যান। আমি নষ্ট ; আমি হীন !

—হ্যাঁ, তুমি নষ্ট ; এখানে যাঁরা আছেন, যাঁদের তুমি ইঙ্গিত করছ, তাঁদের পায়ের নখের যোগ্যও তুমি নও। তুমি সব্বাইয়ের চেয়ে হীন !

সহসা অপরিসীম ক্রোধে আমার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এক সময় যেমন একান্ত মনে মল্লিকাকে ভালোবাসিয়াছিলাম, এখন তেমনিই একান্তমনে তাহার প্রতি সঘৃণ ক্রোধে উগ্র হইয়া উঠিলাম।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওই যে অনিন্দ্যসুন্দরী হৃদয়হীনা নারী, জগতের কত কল্যাণই না সে সাধন করিতে পারিত! কিন্তু তাহার পরিবর্তে কত অমঙ্গল, পরিচিতজনের কত না অনিষ্টই সঙ্গে লইয়া সে ফিরিতেছে! বিশ্ববিধানে এমন অসঙ্গতিপূর্ণ সৃষ্টি আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! কী উদ্দেশ্যে ভগবান তাহাকে সৃজন করিল? সে কী শুধু মানুষের মাঝে অনুক্ষণ বিক্ষোভ জাগাইবার জন্য? তাই যদি হয়, শুধু অনাসৃষ্টির সূচনা করিতেই সে যদি অনুক্ষণ আমাদের প্রলুব্ধ করিয়া ফেরে, তাহা হইলে যত শীঘ্র তাহার সে উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, ততই ত মঙ্গল। আমি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম।

সম্মুখে এক মল্লিকা ব্যতীত সমস্ত জগৎ আমার চোখে ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া ঘুরিতেছিল যেন! কী এক তীক্ষ্ণ এবং ভীষণ অনুভূতির প্রেরণায় মনের মধ্যে নিশ্বাস কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল—যেন এখনি দম্ বন্ধ হইয়া যাইবে। দেখিলাম, মল্লিকা ধীরে ধীরে ওধারে বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে,—তাহার চোখে জল! বাঁচিলাম! বেশীক্ষণ সে সম্মুখে থাকিলে কী করিয়া বসিতাম, কে জানে!

ফিরিয়া আসিয়া মজলিসের এক পাশে বসিলাম। দুর্লভবাবু

বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার চোখ-মুখ উচ্ছ্বসিত। কুমার-বাহাদুর এ অঞ্চলের মধুচক্র! তাঁহাকে ঘেরিয়া আজ যে গৌড়-জনের সমাবেশ, আশা করি, অনাগত ভবিষ্যতে বহুদিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তাঁহাদের এমনি সমাবেশ ঘটিবে। সকলে সহর্ষে করতালিধ্বনি করিল। বক্তৃতা চলিল। এ মিলনের কত যে আনন্দ, কত যে—

সহসা বাগানের ভিতর একখানা গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দে বক্তৃতা থামিল। গাড়ীতে করিয়া এমন সময় কে আসে? সকলের দৃষ্টি উৎসুক হইয়া উঠিল! অরীন্দ্র বলিল—কার গাড়ী? ওঃ, শঙ্কর ব'সে রয়েছে দেখছি! শঙ্কর-ই তো! সঙ্গে কে?

অকস্মাৎ অরীন্দ্রকে কী সাপে কামড়াইল! অমন করিয়া লাফাইয়া উঠিল কেন? দুই চোখে যেন তাহার মৃত্যুর আতঙ্ক! মুহূর্ত্ত পরেই সে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া কাণে কাণে বলিল—বিনু! আমাকে বাঁচাও! না না, কোন প্রশ্ন কোরো না। সব বলব পরে। এমন বিপদে কখনো পড়ি নি। কী হবে, ভাই!

গাড়ী আসিয়া নিকটেই থামিল। প্রথমে শঙ্কর নামিল; এবং তাহার পশ্চাতে নামিলেন, একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবতী নারী; দীর্ঘাঙ্গী, রুক্ষ ঋজু দেহ; চলার ভঙ্গিটা যেন অতিরিক্ত কঠোর। সারা অঙ্গে অলঙ্কার এবং সজ্জার পারিপাট্য ঝলমল করিতেছে।

মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম: শঙ্কর,

এ যে দেখছি, অনেক ভদ্রলোক এসেছেন! এই যে, কেমন আছ তুমি? চিঠির উত্তর দাও নি কেন? আমি কত ভাবছিলাম! বেশ লোক তো!

তিনি সোজা গিয়া অরীন্দ্রের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের চক্ষু তখন কৌতূহলে, ঔৎসুক্যে যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে!

অরীন্দ্র তখন স্খলিত-কণ্ঠে সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—ইনি আমার স্ত্রী। বিমলা, এঁরা সবাই আমার বন্ধু। ইনি—দুর্লভবাবু। হ্যাঁ। আর এঁর কথা তো তোমার কতই লিখেছি।··· হুঁ। আজ সকাল থেকে এমন কাশি করেছে···

খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে অরীন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল······

তাহার পর আমি আর সেখানে দাঁড়াই নাই। মনে আছে, অরীন্দ্রের কথায় সকলেই অল্প-বিস্তর বিস্মিত হইয়াছিল (আমিও বাদ যাই নাই); কিন্তু বজ্রের মতো এই সংবাদ স্তম্ভিত এবং অভিভূত করিয়া দিয়াছিল দুইটি প্রাণীকে।—দুর্লভ রায় এবং তাঁহার কন্যা সবিতা। অরীন্দ্রের কথায় তাহাদের মুখের ভাব কী রকম আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। সেখান হইতে উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

কোথায় যাইতেছি ? কোন ঠিক ঠিকানা নাই। মনে আছে, বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা পায়ে-আঁকা পথ ধরিয়া যেখানে দুই পা আমাকে লইয়া যায়, তাহারই অভিমুখে চলিতে লাগিলাম।*

* * *

* *

যখন বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তখন যেন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পায়ে কাদা লাগিয়াছে, ধূলায় জামা মলিন হইয়া উঠিয়াছে;—যেন আমায় কে ধরিয়া বিষম প্রহার করিয়াছে, সারা দেহে আমার এমনি গ্লানিকর বেদনা অনুভূত হইতেছিল। গাড়ী করিয়াই আমার ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া পায়ে হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিলাম। †

* * *

* *

ঝিল্‌-এর পার দিয়া আমার পথ। দেখিলাম, অসময়ে বৈকা-লের উত্তাল হাওয়ায় ঝিল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ঘোর অকালে

---

* এইখানে প্রশান্তর খাতায় অনেকগুলি লাইন কাটা হইয়াছে, দেখা গেল। দেখিলাম, লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রায় পঞ্চাশ লাইন কাটিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন।—সম্পাদক, 'বজ্রনাদ।'

† এইখানে পুনরায় অনেকগুলি লাইন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটী কথা পড়িতে পারা যায়, যথা---'তাহার সর্ব্ব-শরীর,' 'হাত ধরিলাম,' 'দুই চোখে কী যেন,' এমনি আরও দু'-একটা কথা।

পশ্চিমাকাশে মেঘের সমারোহ দেখিয়া সমস্ত প্রকৃতি যেন ভীত চকিত হইয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ-শীতল বাতাসে হাড়ের মধ্যে তীব্র শিহরণ বোধ করিতেছিলাম। সম্মুখে আমার সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘিকার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন, পশ্চাতে আলোড়িত অরণ্যের মর্ম্মর ধ্বনি। মনে হইল যেন ক্রুদ্ধ প্রকৃতির সম্মুখে অপরাধীর মতো আমি একা দাঁড়াইয়াছি। অন্য সময় কী ভাব·মনে জাগিত বলা যায় না, কিন্তু এখন প্রকৃতির এই উদ্দামতা আমি লক্ষ্যই করিলাম না। মনের ভিতর তখন যে ঝড় বহিতেছে তাহার তুলনায় বাহিরের ইহা কিছুই নয়। ‡

বাড়ী ফিরিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই শুইয়া পড়িলাম। সদানন্দ গম্ভীরমুখে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল; বিড়বিড় করিয়া কত কী বকিতে লাগিল (তাহার ধারণা, আমি আজ অত্যধিক মদ্যপান করিয়াছি, তাই এমন করিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছি) এবং তারপর জামা-কাপড় লইয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে উঠাইতে গেল।

তাহার কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম না। কথা বলিবার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। আমি কী ভীষণ রাগিয়া উঠিয়াছি? কিন্তু না, কাহার উপর রাগিব? ভয় পাইয়াছি?—কিন্তু কিসের ভয়?

‡ আবার কয়েক লাইন কাটা।

সদানন্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্থান করিল ; আমিও বিছানায় গা মেলিয়া চোখ বুজিলাম। মানসিক এবং শারীরিক শ্রান্তিতে আমার দেহ মন বিবশ হইয়া উঠিয়াছে···ক্লান্তিতে ঝিমাইতে লাগিলাম। মনে হইল, চোখের সম্মুখে কুয়াসা ঘনাইয়া আসিতেছে··· বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি······

শীতের সকালে এই কলিকাতা সহরের পরিচিত রাস্তা দিয়া চলিতেছি—একা। কাজ-কর্ম্ম হাতে কিছুই নাই, হাল্কা মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত। একটা প্রকাণ্ড দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়াইলাম—তাহার ভিতর স্তরে স্তরে মেয়েদের শীতবস্ত্র সজ্জিত করা হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন একটা কাচের ঘরের মধ্যে মল্লিকা বসিয়া রহিয়াছে ; আর একটায় সবিতা। দূরে ওটায় কে ? চিনিয়াছি—অরীন্দ্রের স্ত্রী। সকলেই আমাকে দেখিয়া সস্মিত মুখে অভিবাদন করিল ; তাহাদের সহিত কথা বলিতে গেলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন আমার গলা টিপিয়া ধরিল ; কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল :

"খুন করেছে, মেয়েটাকে একেবারে খুন করেছে! পুলিস ডাকো ; পুলিস, পুলিস।"

শিহরিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সদানন্দ ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। উঠিয়া বসিয়া তাহার নিকট পান করিবার জন্য জল চাহিলাম। অত শীতেও আমার কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে।

পাশের বাড়ীর পাগলটা আবার চীৎকার সুরু করিল :

"খুন করেছে! পুলিস ডাকো; পুলিস, পুলিস।"

বাহিরে একটানা শব্দের সুর শোনা যাইতেছে; বৃষ্টি পড়িতেছে অবিশ্রান্ত। ঘুম আসিল না। সার্সির বাহিরে বর্ষণ-মুখর অন্ধকার পৃথিবীর পানে চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলাম। উহারা এখন কী করিতেছে? অরীন্দ্র; তাহার স্ত্রী? দুর্লভ রায়টা আচ্ছা জব্দ হইয়াছে যাহা হউক! বেশ হইয়াছে। সহসা মল্লিকাকে মনে পড়িল···

কাচ ভেদ করিয়া কী ঠাণ্ডা আসিতেছে! সারা দেহ যেন হীম হইয়া উঠিল। হাত পা এমন অবশ হইয়া আসে কেন? কিসের জন্য···*

সহসা জানালার বাহিরে কাহার যেন ছায়া পড়িল! ভীত হইয়া জানালা খুলিয়া চীৎকার করিলাম—কে? কী চাও?

শব্দ হইল—হুজুর!

বলিলাম—কে তুমি? এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এখানে কেন?

ছায়ামূর্ত্তি মানুষেরই। অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, আমি কুমার-বাহাদুরের কাছ থেকে আসচি। চিঠি আছে। বাগানে আজ মানুষ খুন হয়ে গেছে হুজুর, তারই খবর।

ক্ষিপ্রহস্তে পত্র খুলিয়া পড়িলাম—'সমস্ত কাজ ছেড়ে এই মুহূর্ত্তে চলে এসো। মল্লিকা খুন হয়েছে। আমার মাথার ঠিক নেই; মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে যাব। ইতি, তোমার অরি।'

---

* এইখানকার পাণ্ডুলিপি কাটা-কুটিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মল্লিকা···?

মল্লিকা খুন হইয়াছে। মল্লিকা সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত! বাঁচিয়া আছে কি না, তাহার ঠিক নাই···

মাথা ঘুরিতে লাগিল। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যায় না! চোখের সামনে যেন অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে! পায়ের নীচে মাটি কী সরিয়া যাইতেছে না কি ?

দশ

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অরীন্দ্রের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সমস্ত বাড়ীময় একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কাহারো মুখে কোন কথা নাই ; সকলেই যন্ত্রচালিতের মতো ঘোরা-ফেরা করিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম সুমুখের ঘরে অরীন্দ্রের স্ত্রী বিমলা দেবী বসিয়া আছেন এবং তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া রহিয়াছে—শঙ্কর চৌধুরী। লোকটাকে দেখিয়াই আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। যত দিন যায়, উহাকে আমার যেন ততই অসহ্য বোধ হইতে থাকে।

এ-ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অরীন্দ্র অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেছে। অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভীষণ দুর্ঘটনায় তাহার

মতো স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যে অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়িবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? তাহার মাথার সুবিন্যস্ত চুল এলোমেলো; চোখ মুখ সাদা হইয়া গেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে যেন তাহার জীবন ফিরিয়া পাইল; দুই হাত ধরিয়া কাকুতি-পূর্ণ-স্বরে আমাকে কত কী যে বলিয়া গেল, তাহার সব কথা না বুঝিলেও, এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ না এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের একটা কিছু কিনারা হয়, ততক্ষণ যেন আমি তাহাকে ছাড়িয়া না যাই। প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম।

অরীন্দ্র তখন স্খলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল ঃ

—এ ব্যাপার কে ভেবেছিল? উঃ! আহা, বেচারী! ডাক্তার এসেছে, বাসুদেববাবুও এসেছেন,—দু'জনেই বলেছে, আজ রাত কাটবে না। আবার তার ওপর ঠিক এই সময়েই আমার স্ত্রী এসে হাজির! বিপদের ওপর বিপদ। ওকে লাক্‌নোয় বিবাহ করেছিলাম,—সে আজ প্রায় সাত বছরের কথা। কী ভুলই যে করেছিলাম—এখন বুঝ্‌ছি।

একটু থামিয়া আজিকার ঘটনার কথা বলিতে লাগিল ঃ

সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া পড়িল। সে আকস্মিক উত্তেজনা কাটিবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়-ভেদী আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। বনের মধ্য হইতে সে স্বর ভাসিয়া আসিল। একবার, দুইবার, তিনবার। সে চীৎকার এমনিই যে, নিমন্ত্রিতেরা সকলেই

চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত অস্বাভাবিক সে আর্ত্তনাদ, এবং তাহা রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত।

যেদিক হইতে চীৎকার শোনা গিয়াছিল, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো সেই দিকে চাহিয়াছিল, এমন সময় একজন বেহারা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—বাগানের মধ্যে খুন হইয়াছে !!!

—খুন হয়েছে ! কে খুন হয়েছে ?

বেহারা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সকলেই এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইল। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলে হতবাক্ হইয়া নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া রহিল—বেহারাটার মুখ হইতেও কোন কথা সরিল না।

প্রথমে সকলে একটা ভারী পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল—কেহ যেন দুই পা দিয়া গাছগুলাকে সরাইয়া বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহাদের অভিমুখেই আসিতেছে। তারপর সবাই সবিস্ময়ে দেখিল —রক্তমাখা হাতে একটি লোক তাঁহাদের সুমুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ; সমস্ত দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে ; দুই হাতে, জামায়, কাপড়ে তাহার তাজা রক্তের চিহ্ন।

এক নিমেষে অরীন্দ্রের মনে হইল যেন তাহার পা দুইটা মাটিতে বসিয়া গেছে ! সম্মুখে তাহার রক্তমাখা হাতে দাঁড়াইয়া তিনকড়ি !!! সেই তিনকড়ি ! তাহার বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ভৃত্য তিনকড়ি ! নম্র, ভদ্র শান্ত-প্রকৃতির তিনকড়ি ! তাহার আজ এ কী মূর্ত্তি !

কয়েক মুহূর্ত্ত তিনকড়ি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বিকৃত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল—মল্লিকা, মল্লিকা ! এ কী করেছো তুমি !

তাহার অন্তর হইতে উত্থিত সেই কান্নার আবেগ তাহার সারা দেহ আলোড়িত করিয়া তুলিল। মুখ হইতে যখন সে হাত সরাইল, তখন সকলে শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার মুখে, কপালে, গালে রক্তের ছাপ লাগিয়া গেছে !

এই অবধি বলিয়া অরীন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল ; তারপর পুনরায় স্থরু করিল ঃ

—তারপর থেকে আমার চোখের সামনে সব-কিছু অস্পষ্ট হয়ে গিছল ; ভালো করে কিছুই মনে নেই—সব যেন ঝাপ্সা বোধ হচ্ছিল। শুধু এইটুকু মনে আছে—কয়েকজন ধরাধরি করে একটি দেহকে বনের মধ্য থেকে বয়ে নিয়ে এসে, একটা গাড়ীতে চাপিয়ে দিলে। আমি সেদিকে চেয়ে দেখ্‌তে পারি নি—সবাই বলাবলি কচ্ছিল, যে ছোট্ট ছোরাখানা তার চাবীর রিং-এর সঙ্গে বাঁধা থাক্‌তো, সেই ছোরাখানা তার দেহের মধ্যে কে যেন আমূল বসিয়ে দিয়েছে। ছোরাখানা নিশ্চয় তোমার মনে আছে—সোণা-বাঁধানো, হাতলের ওপর পাথরের কাজ করা ? পশ্চিম থেকে এনেছিলাম—সৌখীন জিনিষ ; কিন্তু ধার ছিলো ক্ষুরের মতো। ওকে উপহার দিয়েছিলাম। কে জানতো বল, তারই দ্বারায় এমন ভীষণ কাণ্ড হবে ?

বকিতে বকিতে অরীন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল ঃ

—আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে! যা কিছু করবার সব কর ভাই—আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। এই সময়ে আবার উনি এলেন—আমার স্ত্রী! সে কোথায়, দেখেছো তাকে?

বলিলাম—হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি ও ঘরে আছেন। শঙ্করবাবুও আছে তাঁর সঙ্গে।

—শঙ্কর? ও, হ্যাঁ। তোমাকে বলি নি এতদিন।—শঙ্কর ওর ভাই। ওই আর এক শয়তান! লাক্‌নো থেকে যখন পালিয়ে আসি, তখন থেকে ও আমার পিছু পিছু আছে। কত টাকাই যে ও আমার কাছ থেকে আদায় করেছে, তার বোধ করি হিসেব নেই। সোয়াইন্‌!

শঙ্কর চৌধুরীর রহস্য-পূর্ণ আচরণের সমস্ত ব্যাপার এক নিমেষে আমার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। উঠিয়া পড়িলাম।

অরীন্দ্র আমাকে থামাইয়া বলিল—শোনো! বিনু! তিনকড়ি আমাকেও হয় ত—জানো ত আমার ওপর কী রকম জাতক্রোধ আছে ওর! আমাকেও ও খুন করে' ফেলবে না ত?

—তোমাকেও মানে? মল্লিকা-কে কী তা হ'লে ও-ই খুন করেছে?

—নিশ্চয়ই! কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না, কেমন করে' ও সেখানে এলো। ও ত জানতো না যে, সেদিন আমরা ওই-খানে পিক্‌নিক্‌ করব?

কহিলাম—এ-সব বিষয়ে তুমি কিছু বুঝবে না। হ্যাঁ, ছাখো—

একটা কথা। চাকরীর খাতিরে আমি এ-কেসের তদন্ত করব ; সুতরাং তোমার মতামতের দ্বারা আমাকে বিরক্ত কোরো না ;— শুধু যা' জিগ্‌গেস করব—তার উত্তর দিও।

এগারো

মল্লিকা যে ঘরে শুইয়াছিল, সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

ঘরের কোণে একটি বাতিদানে এক জোড়া বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই ক্ষীণ আলো মল্লিকার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আলো অত্যন্ত অপ্রচুর···তাহার সাহায্যে লেখা বা পড়ার কাজ করা চলে না। মাটীর উপর বিছানা পাতা হইয়াছে—তারই উপর মল্লিকার দেহ শায়িত। গাত্রবস্ত্র তখনো তাহার পরিবর্ত্তন করানো হয় নাই—কে ই বা তাহার কাপড় বদলাইয়া দিবে? শুধু গায়ের উপর একখানা দামী শাল ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরের স্বল্প আলোয় তাহার মুখখানি ভালো দেখা যাইতেছে না বটে, তবে সে-মুখের রক্তশূন্যতা সেই মৃদু আলোর মধ্যেই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—স্থানীয় ডাক্তারটি মল্লিকাকে কী-একটা ঔষধ সেবন করাইতেছেন। দূরে বাসুদেব বসিয়া আছে। আর তাহারই অনতিদূরে ঘরের কোণে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে—তিনকড়ি। তিনকড়িকে দেখিয়া মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শিহরণ অনুভব করিলাম। তাহাকে চেনা দুষ্কর—মুখ তাহার এমনি বিকৃত, দুই চোখে তাহার এমনি ভাবহীনতা, সারা দেহে তাহার এমনি সীমাহীন শ্রান্তি !

তাহাকে দেখিতে দেখিতে আমার পাশের বাড়ীর পাগলটার চীৎকার মনে পড়িল ! তাহার অর্থহীন প্রলাপ কী অবশেষে সত্যে পরিণত হইল ? কে জানে !

আমার প্রতি চাহিয়া বিরূপাক্ষবাবু (স্থানীয় ডাক্তারটির নাম বিরূপাক্ষ তলাপাত্র) বলিলেন—মশায়, বলতে পারেন, এ-বাড়ীর কর্ত্তা কে ?

বলিলাম—এখানে এখন কর্ত্তা কেউ নেই। বিশৃঙ্খলার রাজত্ব।

তলাপাত্র কহিলেন—তাই ত দেখ্‌ছি। দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল মশায়, খানিকটে গরম জল চেয়েছি ;—কিন্তু কেউ যেন শুন্‌তেও পায় না। দু'ঘণ্টা আগে একটু ব্রাণ্ডি চেয়েছিলাম, তাও এখনো আসে নি। এর মানেটা কী ? একটী মেয়ে এখানে যায়-যায় : আর বাড়ীর কারো ইয়াদ-ই নেই। ওষুধ আনতে পাঠাবো—কোন বেটা চাকরের পাত্তা নেই। এমন বাড়ী ত জন্মে কোথাও দেখি নি। এরা কী মানুষ ?

তলাপাত্রের কথার একটিও মিথ্যা নহে। সত্যই, এখানকার

চাকরগুলা সকলেই এমনি দুর্বিনীত এবং পাপিষ্ঠ যে, ইহাদের দ্বারা একমাত্র অরীন্দ্র এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের মদ্য সরবরাহ করা ছাড়া অন্য কোন কাজই হয় না। হইবেই বা কেমন করিয়া? মনিব যদি সারাক্ষণ পাপের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার চাকরগুলা যে ওইরূপই হইবে, ইহাতে বিচিত্র কী আছে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে* তলাপত্রের একজন সহকারী ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঔষধ খাওয়ানো এবং ইনজেক্সনের পর তলাপত্র মল্লিকার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—শুনছেন! চেয়ে দেখুন। কে এসেছেন, দেখুন!

—হয় ত জ্ঞান ফিরবে না। ভীষণ রক্তক্ষয় হয়েছে, তা ছাড়া, কানের কাছে কপালের ওপর বোধ হয় ঘুষি মারা হয়েছে—তার দরুণ মাথার শির হয় ত ছিঁড়ে গেছে।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। তলাপাত্র তাড়াতাড়ি তাহার মুখে একটা উত্তেজক ঔষধ ঢালিয়া দিল। ঔষধে কাজ হইল।

তলাপাত্র বলিলেন—এইবার আপনার যা-যা জিজ্ঞাসা করবার আছে—সেরে নিন। যান্, কাছে যান।

---

* এই একঘণ্টা ধরিয়া দারোগা-মহাশয় কী করিলেন? তিনি সেখানে গিয়াছেন তদন্ত করিতে কিন্তু, পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, এই একঘণ্টাকাল তিনি নিজের কোন কাজ না করিয়া অরীন্দ্রের চাকর-বাকর সম্বন্ধে তলাপাত্রের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন—সং, ব্রঃ।

আমি শয্যার নিকটে গিয়া বসিলাম। মল্লিকার দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইল। কী মর্ম্মস্পর্শী সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টি আজো ভুলি নাই।

—আমি কোথায়? ক্ষীণ কণ্ঠে মল্লিকা বলিল।

কহিলাম—মল্লিকা! আমাকে তুমি চেনো?

কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া মল্লিকা আমার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ক্ষীণতর কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ! খুব চিনি।

—আমি বিনায়ক বসু—পুলিশের দারোগা। কুমার-বাহাদুরের মারফত তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। মনে আছে?

মল্লিকা তাহার বাঁ-হাতখানি আমার কোলের উপর রাখিয়া বলিল—মনে নেই আবার? সব মনে আছে! তুমি কখন এলে? আরও কাছে এসে বোসো না!

তলাপাত্র আমার কানে কানে কহিলেন—ডিলিরিয়ম্! হোপ্‌লেস্!

—আমি বিনায়ক বসু। পুলিশের দারোগা। তোমার মনে থাকতে পারে—আজকের বাগান-পার্টিতে আমি ছিলাম। এখন কেমন বোধ করছ?

তলাপাত্র আবার আমার কানে কানে কহিলেন—যা-যা আপনার অবশ্য-প্রয়োজনীয় কথা শুধু সেই-গুলিই জেনে নিন। এ-জ্ঞান বেশীক্ষণ থাকবে না।

কহিলাম—আপনি দয়া করে একটু থামুন। কী প্রশ্ন করতে হবে না হবে, তা আমি জানি। তার পর মল্লিকার দিকে ফিরিয়া বলিমাম—আজকের দুপুরের ঘটনা মনে করে' স্থাখো ত। আচ্ছা, আমিই তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি,—আমরা কুমার-বাহাদুরের নিমন্ত্রণে তাঁর বাগানে গিছলাম,—তুমি গিছলে, আমি গিছলাম, দুর্লভবাবুরা গিছলেন; আরও কত কে গিছলেন। মনে পড়ছে? আচ্ছা। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে' তুমি বনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে। করলে ত? আচ্ছা। এইবার সমস্ত শক্তি দিয়ে স্মরণ কর—বনের মধ্যে তোমায় হঠাৎ কে-যেন আক্রমণ করলে—আমি জান্‌তে চাই, কে সে।

মল্লিকা চোখ মুদিয়া আমার কথা শুনিতেছিল; এইবার চোখ খুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

—আমাদের কাছে সেই লোকটির নাম তোমায় বল্‌তে হবে। আমি ছাড়া, এ-ঘরে আরও তিনজন লোক আছেন।

মল্লিকা ধীরে ধীরে তাহার মাথাটি এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিল। সে বলিবে না।

কহিলাম—বল্‌তেই হবে তার নাম তোমায়। তাকে এর সমুচিত দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করব। তাহার নৃশংসতার জন্য তাকে গুরুতর দণ্ড ভোগ করতে হবে। আইনের যা চরম দণ্ড তাই দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। বল তার নাম—আমি অপেক্ষা করে' রইলাম।

মল্লিকা স্তিমিতভাবে স্বল্প একটু হাসিল এবং আর একবার

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না,—হত্যাকারীর নাম সে উচ্চারণ করিল না।

ভোরের আকাশে শুকতারাটির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে—মল্লিকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

বারো

পরদিন প্রাতঃকালে দুইজন সহকারী লইয়া পুনরায় তদন্ত সুরু করিলাম। বাড়ীর চাকর-বাকর দরওয়ান-বেহারা সকলকে পরীক্ষা করিলাম, প্রশ্ন করিলাম। দুইদিন ধরিয়া জোর তদন্ত করিয়া দীর্ঘ এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম।

প্রথমে, কী অবস্থায় আমি আহত মল্লিকাকে দেখিতে পাই, তাহার বিবরণ দিলাম: শেষের দিকে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আমার পুনঃপুনঃ প্রশ্নেও সে তাহার আঘাত-কারীর নাম আমাদের কাছে বলে নাই। তাহার আচরণ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল যে, তাহার নাম মল্লিকা জানে, ইচ্ছা করিয়াই তাহা সে গোপন করিল। সুতরাং, আঘাতকারী যে তাহার আপন-জন তাহাতে সংশয় নাই।

তারপর তাহার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা লিখিলাম: দেহের কোন্ দিকে এবং কোন্ অংশে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাও সবিস্তারে লিখিলাম। তাহার অঙ্গে যে-সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার

একটিও খোয়া যায় নাই,—কানের দুল, হাতের চুড়ী, গলার চেন-হার,—সমস্তই যথাস্থানে ছিল। স্পষ্টই দেখা গেল, চুরীর উদ্দেশ্যে তাহাকে খুন করা হয় নাই।

কী ভাবে সে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহাকে হত্যাকারী আঘাত করিয়াছিল—তাহার যে ছবি আমি কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহাও নথিবদ্ধ করিয়া দিলাম :

মল্লিকা অন্য সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করে। নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া সে বনের মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হইয়া যায়। সেইখানে সে তাহার আততায়ীর সাক্ষাৎ পায়। সে যখন একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় লোকটি তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথমে লোকটিকে দেখিয়া মল্লিকার মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগে নাই—তাহা হইলে সে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিত। তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে লোকটি মল্লিকার বাঁ-হাতের মনিবন্ধটি দৃঢ়-বলে চাপিয়া ধরে—এমনি সজোরে ধরে যে, চুড়ীগুলি বাঁকিয়া গিয়া হাতের উপর কালশিরা পড়িয়া যায়। সেই সময়ে মল্লিকা চীৎকার করিয়া ওঠে এবং সে চীৎকার অরীন্দ্র এবং তাহার নিমন্ত্রিতগণ সকলেই শুনিতে পায়। সেই চীৎকারের পরেই লোকটি মল্লিকাকে সবলে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া তাহার মাথায় ঘুষি মারে; তারপর মল্লিকার নিকট হইতেই তাহার ছুরীখানি কাড়িয়া লইয়া তাহার বুকের ডান দিকে পাঁজ্‌রার উপর বারবার আঘাত করে।

তদন্ত করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া

হত্যার এই ছবি আঁকিলাম। এখন প্রশ্ন হইতেছে—হত্যাকারী কে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এ-প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

প্রথমত দেখা যাইতেছে যে, চুরী বা অন্য কোনরূপ পাশবিক দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য এ-কাজ করা হয় নাই। সুতরাং সাধারণ কোন চোর বা বদমায়েস যে এ-কাজ করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

দ্বিতীয়ত, মল্লিকা ইচ্ছা করিয়াই হত্যাকারীর নাম আমার কাছে বলে নাই,—কোন সাধারণ চোর বা বদমায়েস হইলে নিশ্চয় সে তাহার নাম বা তাহার চেহারার বর্ণনা করিত। মনে হয়, এই হত্যাকারী তাহার কোন প্রিয়জন, যাহার শাস্তি সে কামনা করে না। এখন, এই প্রিয়জন কে হইতে পারে? তাহার উন্মাদ পিতা নিশ্চয় নহে। তিনি ত দিনরাত তাঁহার ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাকেন। সুতরাং, তাঁহার কথা বাদ দিলাম। কুমার-বাহাদুর? কিন্তু কুমার-বাহাদুর ত একবারো তাহার অতিথিগণের নিকট হইতে উঠিয়া অন্য কোথাও যায় নাই। সুতরাং, তৃতীয় ব্যক্তি, যাহার উপর সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া বসে,—সে হইতেছে, তিনকড়ি। যে-অবস্থায়, যে-ভাবে তিনকড়িকে লোকে দেখিয়াছিল, তাহাতে এ-বিষয়ে কাহারো কোন সংশয় ছিল না যে, সে-ই তাহার বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে।

পরদিন থানায় বসিয়া তিনকড়ির জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম।

তিনকড়ি প্রথমে যথারীতি পিতৃ-পরিচয় দিল। তারপর তাহার চাকুরীর কথা এবং মল্লিকাকে বিবাহ করার কথা বলিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রশ্ন করিলাম—বিবাহ করবার পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বনিবনাও হত না—এ কথা সত্যি?

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু হুজুর, দয়া করে ও-সব আমায় জিগ্‌গেস করবেন না। সবই ত জানেন!

—না, আমি কিছুই জানি না। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,—তোমার স্ত্রীকে তুমি কোনদিন প্রহার করেছিলে?—কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিকৃত ক'রে দেখে তুমি কী তাকে কোন দিন আঘাত করেছিলে? উত্তর দাও।

—না, প্রহার করি নি। শুধু একদিন রাগের বশে তার হাত ধরেছিলাম। দয়া করে ও-সব কথার রেহাই দিন, হুজুর।

—কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর যে অবৈধ সম্বন্ধ ছিল, তা তুমি জানতে?

—জানতাম বৈকি।

কহিলাম—তোমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে এই কথাটুকু লিখে নিলাম; অন্য কথা পরে জিজ্ঞাসা করব। এখন বল দেখি, যে বনের মধ্যে তোমার স্ত্রী হত্যাকারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই বনের মধ্যে ঠিক সেই সময় তুমি কেমন করে উপস্থিত হলে?

—বলছি, হুজুর। ভিন-গাঁয়ে এক আত্মীয় বাড়ীতে থাকতাম:

ছেলেটাকে তাদের কাছে রেখে আমি চব্বিশ ঘণ্টা এক তাড়ির দোকানে বসে তাড়ি খেতাম। পয়সার অভাবে দু'দিন তাড়িও জোটে নি। সেদিন সকালে মাথাটা পরিষ্কার ছিল—অনেকদিন পরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করবার ভারী ইচ্ছা হল। কী জানি সে কেমন আছে? একবার দেখে আসবো—তাতে আর ক্ষতি কী? এই মনে করে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরবেলা এ-গাঁয়ে এসে পৌঁছলাম। এ-গাঁয়ে আসতে হলে, দীঘির ধার দিয়ে ঐ বনের পাশ দিয়েই আসতে হয়—আর পথ নেই। বনের ধার দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম—ভারী করুণ সে আওয়াজ, মেয়ের গলা। বনের ভিতর থেকে শব্দটা এসেছিল;—সেই দিকে ছুট্‌লাম। তারপর···

তিনকড়ি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্বরু করিল:

—তারপর হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম, একটি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করছে।—কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম, মল্লিকা! তার বুকের কাপড় রক্তে ভেসে গেছে,—মুখ তার যন্ত্রণায় কী রকম হয়ে গেছে,—কাতর কণ্ঠে সে আর্ত্তনাদ করছে। দেখেই আমি তাকে দু'হাতে করে' মাটী থেকে তুলে নিলাম···। কোন লোককে কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না; খালি, দূরে পায়ের শব্দ পেলাম—কে যেন পালাচ্ছে—

কহিলাম—বেশ একটি গল্প বানিয়ে রেখেছো! কিন্তু জজে তোমার এসব বানানো কথার কিছুই বিশ্বাস করবে না। হঠাৎ তুমি অমনি সেখানে উপস্থিত হলে, বলা নেই কহা নেই আর-এক-

জন লোক বিনা কারণে তোমার স্ত্রীকে হত্যা করে পালালো, আর তুমি এসেই তাকে বুকে তুলে নিলে,—এ সব নিতান্ত মন্দ তৈরী করো নি ; কিন্তু কোন ফল হবে না।

তিনকড়ি কহিল—এ সব আপনি কী বল্‌ছেন ? আপনি কী আমাকে সন্দেহ করেন ?

—শুধু সন্দেহ নয়, যা যা প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। আমার মনে হয়, তুমি যদি আর কথা না বাড়িয়ে সব কথা স্বীকার করো, তা হলে আমাদেরও কাজের সুবিধে হয়, আর তোমার পক্ষেও সেটা মঙ্গলজনক হয়। আজ যাও, কাল আবার তোমায় প্রশ্ন করব। ভেবে-চিন্তে উত্তর দিও। যাও।

তিনকড়ি খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল তারপর পাহারালার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই জেলা হইতে একজন প্রধান ইন্‌স্‌পেক্‌টার আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটির নাম—প্রলয়েশ রুদ্র। বয়স আমারই সমান হইবে। ব্যবহারে এবং কথায় অখণ্ড চাল,—ধরাকে অনুক্ষণ সরা জ্ঞানে অবহেলা করেন।

আসিয়াই প্রথমে দাড়ী কামাইতে বসিলেন ; এবং তাহারই

ফাঁকে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন---এ-কাজটা যেন কিছুই নয়, এমনি তাহার নির্ব্বিকার ভাব।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে বিবৃত করিলাম। সকল কথা শুনিয়া রুদ্র প্রশ্ন করিল—খবর পাবামাত্র ঘটনা-স্থলে গিছলেন ত? রিপোর্টে সে-কথা ত কিছু লেখেন নি।

কহিলাম—না, সেখানে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করি নি।

—হুঁ। এত বড় দরকারী কাজটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলেন। যাই হোক্, তিনকড়ির জবানবন্দী দেখি।

কাগজ-পত্র তাহার সামনে ধরিয়া দিলাম। অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সে সে-গুলি দেখিতে লাগিল। তাহার আচরণে লোকটার উপর আমার ক্রোধের অবধি রহিল না।*

তিনকড়িকে আবার আমাদের কাছে আনা হইল। জেরায় তিনকড়ির নিকট হইতে নূতন কিছুই পাওয়া গেল না; শুধু সে বার বার বলিতে লাগিল:

—আমি খুন করেছি মল্লিকাকে !! আমি? এ-ও কী সম্ভব?

---

* প্রলয়েশের উপর বিনায়কের কেন যে এত রাগ, তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কোন অপরাধ সে ত করে নাই---শুধু বিনায়কের ভুলগুলি ধরিয়া দিয়াছিল।---সং, ব্রঃ।

প্রলয়েশ তাহাকে ধমক দিল :

—চুপ করো। আর ন্যাকামো করতে হবে না। তোমার মতো ঢের বদমাস-কে আমরা সায়েস্তা করেছি। স্বীকার করো আর না-করো, তুমি-ই যে হত্যাকারী, সে-বিষয়ে আমাদের কারুর সন্দেহ নেই। যাও।

কুমার-বাহাদুরকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি আসিলে, প্রলয়েশ তাঁহাকেও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা-বাদ করিতে লাগিল।

অরীন্দ্র বলিল—সমস্তই বল্‌ছি,—সিগারটা আগে শেষ করে নি। হ্যাঁ। আপনি কত দিন এ-জেলায় এসেছেন? দু' বছর। বলতে পারেন, জজ-সাহেবের স্ত্রীর সেই কেলেঙ্কারী ব্যাপারটা শেষ অবধি কী দাঁড়ালো। ও, ও-সব খবর রাখেন না বুঝি? ভালো। হ্যাঁ বলি। তিনকড়িই যে মল্লিকাকে খুন করেছে, সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এই বলিয়া আগাগোড়া অরীন্দ্র যাহা বলিল, তাহা আপনারা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। উপরন্তু, প্রলয়েশের অনুরোধে সে সবিস্তারে মল্লিকার সহিত নিজের জঘন্য সম্বন্ধের কথা বিবৃত করিল। তাহার কথা হইতে একটি নূতন তথ্য পাইলাম—যাহা আপনারা এখনো জানেন না। শুনিলাম, ভিন-গাঁয়ে অবস্থান কালে তিন-কড়ি অনেকবার কুমার বাহাদুর-কে পত্রাঘাত করিয়াছে; কোন কোন চিঠিতে সে তাহাকে গালিগালাজ করিয়াছে; কোনখানাতে হয় ত তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কাতর অনুনয় জানাই-য়াছে। এই চিঠিগুলি আমাদের অনেক সহায়তা করিল।

পরের দিন প্রলয়েশ তাহার লিখিত অভিমত আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। তাহার মতে—নিঃসন্দেহে তিনকড়ি অপরাধী। অভিমত পাঠ করিয়া একটু হাসিলাম। কী নূতন সংবাদ-ই শোনাইলে!

তেরো

দিন তিন-চার পরে।

সকালবেলা। কয়েকখানি জরুরী চিঠির খসড়া করিতেছিলাম। কাজের সুবিধার জন্য অরীন্দ্রের বাড়ীর একটি ঘরে আপিস বসাইয়া ছিলাম ; প্রলয়েশ রুদ্রও আমার এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিল। তিনকড়িকে নিকটস্থ কয়েদখানায় রাখা হইয়াছিল। অরীন্দ্রের বাড়ী হইতে কয়েদখানা এক মিনিটের পথ ; সুতরাং, যখন ইচ্ছা তিনকড়িকে আমাদের সুমুখে হাজির করা যাইতে পারিত। আমার নিজের বাড়ী সেখান হইতে পাকা দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত ; থানার দূরত্ব আরও বেশী। তাই অরীন্দ্রের বাড়ীতে আপিস বসাইয়া সকল দিক্ দিয়াই আমার কাজের সুবিধা হইতেছিল। এ-কয়দিন রাত্রেও সেখানে থাকিতাম।

প্রথম চিঠিখানি শেষ করিয়াছি, এমন সময় বাহিরে ভীষণ গোলমাল শুনিতে পাইলাম। দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, অন্য সব চাকর-বেহারা মিলিয়া কুমার-বাহাদুরের খাস-চাকর কার্ত্তিক-কে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সুখন

বেহারা বলিয়া উঠিল—হুজুর, এ-কে আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন না, পাজী-টা কিছুতেই যেতে চাইচে না।

উঠিয়া বাহিরে গিয়া বলিলাম—কেন, ওকে আমার কাছে আনতে চাচ্ছ কেন?

—হুজুর! কার্ত্তিক খুন করেছে!

—কার্ত্তিক খুন করেছে! কাকে খুন করেছে?

—তিনকড়ি দাদাবাবুর ইস্ত্রীকে। তেনাকে আপনারা শুধু শুধুই আটক করেছেন হুজুর! খুন করেছে এই কার্ত্তিক!

কার্ত্তিক বিকট-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—না, হুজুর। মিছে কথা। ভগবান জানেন হুজুর, আমার কোন অপরাধ নেই।

সুখন এবার দস্তুরমতো জেরা আরম্ভ করিল—দোষ নেই? তবে তোর জামায় রক্তের দাগ এল কেমন করে? কেন বলতে পারিস না—কেমন করে রক্ত লাগলো তোর ফতুয়ায়? আর লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতো সে-জামা ধুয়েই বা ফেলছিলি কেন? এই গিরিধারি, নিয়ে আয় ত জামাটা।

নিমেষ মধ্যে গিরিধারী একটা আধময়লা ফতুয়া আমার সম্মুখে আনিয়া মেলিয়া ধরিল। দেখিলাম, সত্য-সত্যই তাহার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ অস্পষ্ট হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে।

তাহাকে জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া জানিতে পারিলাম, ঠিক যে সময়ে অরীন্দ্র এবং তাহার অতিথিগণ বনের ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠের অর্ত্তনাদ শুনিতে পান, তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কার্ত্তিক বনের সেই অংশে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনো ফিরিয়া আসে নাই। বনের

মধ্য হইতে মল্লিকাকে যখন বেহারারা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তখনো কার্ত্তিককে কেহ দেখে নাই।

আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাকরটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার ভীত ত্রস্ত মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিলাম—যা জিজ্ঞাসা করব, সব কথা যদি ঠিক ঠিক বলিস্, তা হলে তোকে ছেড়ে দেব ; তা না হলে কিন্তু গোলমাল হবে। বল্ সত্যি করে—বনের মধ্যে গিয়েছিলি ?

—আজ্ঞে হুজুর, গিছলুম। বাবুদের দেবার সময় নিজেও একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলুম হুজুর, মিথ্যে কথা বলব না হুজুর, তাই মথাটা কেমন ঘুরছিল। বনের মধ্যে নিরিবিলি এক জায়গায় একটু শুয়ে বিশ্রাম করব ভেবেই বনের মধ্যে ঢুকেছিলুম। একটুখানি গিয়েই, ফাঁকা জমি দেখে আমি শুয়ে পড়লুম—আর সঙ্গে সঙ্গে হুজুর, ঘুমিয়ে পড়লুম। কে যে খুন করলে, কে চীৎকার করলে, এ-সব কিছুই শুনি নি। দোহাই হুজুর, একটি কথাও মিথ্যে নয়।

—তোর ফতুয়ায় রক্ত লাগল কেমন করে ?

—তা ত জানি না, হুজুর।

—মানে ? ফতুয়া কী তোর নয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু কেমন করে যে তাতে রক্ত লাগ্‌ল, তা জানি নি। জেগে উঠে দেখতে পেলুম।

—বাজে কথা রেখে দে। নিশ্চয় জানিস তুই, কেমন করে ফতুয়ায় ছাপ লাগলো। যা, ভালো করে ভেবে-চিন্তে কাল এসে

আমায় বল্‌বি। খবরদার, মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করিস নি

পরদিন সকালে আবার সকলে মিলিয়া কার্ত্তিক-কে আমার কাছে লইয়া আসিল।

কহিলাম—ভেবে ঠিক করেছিস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেমন করে তোর জামায় রক্ত লাগলো ?

—মনে পড়ছে হুজুর। কিন্তু সে যেন স্বপ্নের মতো, ধোঁয়ার মত। সে সত্যি কি না, জানি না ; কিন্তু মনে পড়ছে।

—কি মনে পড়ছে, বল্‌।

—আশ্চর্য্য !···ঠিক যেন কুয়াশার মতো ঝাপ্‌সা···শুয়েছিলুম ঘাসের ওপর···নেশাটা খুব ধরেছে তখন···ঝিমুচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল, কে যেন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে···চোখ খুলে দেখি, এক-জন ভদ্রলোক। ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না, আবছা দেখাচ্ছিল—একজন লোক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর নীচু হয়ে তাঁর হাত আমার জামার ওপর মুছলেন—বেশ ভালো করে মুছলেন ···ভালো করে চাইতে পাচ্ছিলাম না···মনে হল, যেন তাঁকে চিনি।

—কী রকম ভদ্রলোক ?

—ঠিক বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক, তিনি চাকর-

বাকর বা ছোটলোক নন ;—কাপড়-চোপড় তাঁর ভদ্রলোকের মতো। কিন্তু তাঁর চেহারা আমার কিছু মনে নেই।

—তাকে কি তিনকড়ির মতো দেখ্‌তে? ভালো ক'রে মনে করে ছাখ্‌।

—না, তাঁর মতো নয়। কিম্বা হবেও বা। কিন্তু বোধ হয় তিনি নয়।

—যা, ভালো করে মনে করে দেখ্‌গে যা। কাল এসে বল্‌বি। এই বলিয়া তাহাকে সেদিনকার মতো বিদায় করিয়া দিলাম।

সহসা আমার এই প্রায়-সমাপ্ত আখ্যায়িকার ভিতর কার্ত্তিক-এর আবির্ভাবে সমস্ত গুলাইয়া গেল। কী করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। কার্ত্তিক তাহার দোষ অস্বীকার করিতেছে, কিন্তু তাহার জামায় রক্তের ছাপ সম্বন্ধে সে কোন সন্তোষজনক উত্তরও দিতে পারিতেছে না। আমার মনে হয়, সে যে অচেনা ভদ্রলোকের কথা বলিতেছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা ; ইহার ভিতর কোন গূঢ় অর্থ আছে।

খবর শুনিয়া প্রলয়েশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহার বক্তৃতা সুরু করিল :

—দেখলেন ত! তখনই যদি ঘটনা-স্থলে গিয়ে তদন্ত করতেন,

তা হলে এ নতুন উৎপত্তি হতে পারতো না। তখনই যদি সব চাকরদের ডেকে এক্‌জামিন করতেন, তা হলে তখনই ওই চাকর-টার খোঁজ পড়ত এবং অনেক-কিছু তথ্য পাওয়া যেত।

ঘণ্টা দুই ধরিয়া প্রলয়েশ কার্ত্তিককে জেরা করিল। কিন্তু কোন সূক্ষ্ম খবর পাওয়া গেল না।

—কতখানি মদ টেনেছিলি? বল্।

—আজ্ঞে, তা, তা, আধবোতল হবে।

—হুঁ। আচ্ছা, বিনায়কবাবু, তিনকড়িকে আনান ত।

তিনকড়ি আসিল।

প্রলয়েশ কার্ত্তিক-কে প্রশ্ন করিল—চেয়ে ছাখ্ এর দিকে। সে লোকটাকে এবার মনে পড়ছে?

—আজ্ঞে হুজুর, বোধ হয় না। কিম্বা হবেও বা। কিন্তু খুব সম্ভব নয়।

বিরক্ত হইয়া প্রলয়েশ চলিয়া গেল। দুই জনের ব্যবস্থা করি-বার জন্য আমাকে ঢালোয়া হুকুম দিয়া গেল।

তদন্ত চলিতে লাগিল। তিনকড়ি এবং কার্ত্তিককে একই কয়েদ খানায় দুইটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তিনকড়ি দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছিল; তাহার মুখ-চোখে সীমাহীন অবসাদ ঘনাইয়া উঠিয়াছে যেন। কার্ত্তিক ধৃত হইয়াছে শুনিয়া সে আনন্দ

প্রকাশ করিল ; বলিল—ঠিকই হয়েছে। এতক্ষণে সত্যিকারের খুনেকে পাওয়া গেছে। ও সয়তান ব্যাটাকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি। এইবার বোধ হয় আমি ছাড়ান পাবো।

চৌদ্দ

দিন দুই দিন পরে জেলার আসিয়া বলিল—কার্ত্তিক আমার সহিত দেখা করিতে চায়।

তাহাকে লইয়া আসিতে বলিলাম।

কার্ত্তিক আসিয়া দাঁড়াইল। কহিলাম—কী বলবার আছে বল্। বলেছি ত সত্যি কথা বল্‌লেই ছাড়ান পাবি।

কার্ত্তিকের মুখে কথা নাই; আমার মুখের পানে ভীত-নেত্রে চাহিয়া সে মূক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, ভয়ে সে যেন কাঁপিতেছে।

কহিলাম—কি রে বল্, কী বল্‌বার আছে?

কার্ত্তিক কম্পিত-কণ্ঠে কহিল—সে এক ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার হুজুর! কালকে সেই ভদ্রলোকের কথা ভাবতে ভাবতে, তিনি কী রকম জামা গায়ে দিয়েছিলেন, তা মনে পড়ল,—আজকে তাঁর মুখখানাও যেন মনে পড়ছে!

—বটে! কে সে?

—বলতে ভয় পাচ্ছি হুজুর। দয়া করে' আমায় বলতে বলবেন না। আমার বোধ হয়, ওটা সত্যি নয়,—স্বপ্ন।

—স্বপ্ন হোক্ আর সত্যি হোক্, বল্ তুই।

—প্রথমে ভেবেছিলুম, বলব ; এখন কিন্তু ভয় হচ্ছে—শুনলে অপনি হয় ত রেগে উঠে আমায় শাস্তি দেবেন। কাল বল্‌ব হুজুর ; বড়ো পুলিশ-বাবুর কাছে বল্‌ব ; আজ…

তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল —এমনি করিয়া অনর্থক আমার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা! তাহাকে আমার সুমুখ হইতে লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম।*

সন্ধ্যায় কয়েদখানায় গিয়া মিছামিছি করিয়া তিনকড়িকে বলিলাম, কার্ত্তিক তাহাকেই খুনী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। শুনিয়া তিনকড়ি বলিল—এ ত আগে থাকতেই জানতাম।

ইহার বেশী আর কিছুই বলিল না। নিঃসঙ্গ কয়েদ বাস করিয়া তিনকড়ির স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেছে ; চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে ; দেহ অত্যন্ত কৃশ হইয়া গেছে। তাহার অনুরোধ মঞ্জুর করিয়া গার্ড্‌দের আদেশ দিলাম, তিনকড়ি যদি তাহার ঘরের বাহিরে এই বাড়ীর ভিতর বেড়াইতে চায়, তাহাকে সে-অধিকার দেওয়া যাইতে পারে ; ঘরে তাহার চাবী-বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

---

* কী চমৎকার তদন্ত! তাহাকে তাড়াইয়া না দিয়া, জোর করিয়া জেরা করিয়া তাহার যাহা বক্তব্য তাহা জানিয়া লওয়াই উচিত ছিল।—সঃ, ব্রঃ।

তিনকড়ির নিকট হইতে কার্ত্তিকের ঘরের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—ভেবে দেখেছিস ; কিছু বলবার আছে ?

—আজ্ঞে না। আপনার সামনে বলতে পারবো না। ইনস্‌পেক্‌টার বাবু আসুন, তাঁর কাছে বলব।

—বেশ, তাই বলিস।

পরদিন সকালে কয়েদখানার জেলার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার সুমুখে আসিয়া বলিল—কার্ত্তিক খুন হয়েছে !

—সে কী !!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালে সাড়া-শব্দ না পেয়ে দরজা খুলে দেখি বিছনার ওপর ও উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম—মারা গেছে। কে যেন গলা টিপে ওকে পিষে মেরেছে। রোগা মানুষ, বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে নি।

কার্ত্তিক আমাদের মামলার পক্ষে সাক্ষী হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এমনি করিয়া কে তাহাকে হত্যা করিল ? হত্যাকারীর অনুসন্ধানে বেশীদূর যাইতে হইল না ; সে কাছেই ছিল।

তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া কহিলাম—স্ত্রীকে খুন করেই ক্ষান্ত

হ'লে না, শুধু শুধু একজন নিরপরাধী চাকরকে পর্য্যন্ত এমন করে' হত্যা করলে! কী তার অপরাধ?—না, সে তোমায় দোষী বলে' সনাক্ত করেছিল!

আমার কথা শুনিয়া তিনকড়ি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কাল তোমাকে এই জেলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি আমি দিয়েছিলাম,—এমনি করে-ই তুমি সে অনুমতি পালন করলে!

তিনকড়ি শুধু বলিল—এ সব আপনি কী বল্‌ছেন?

—প্রমাণ চাও? এখুনি সে-সব প্রমাণ দিচ্ছি! আমার হুকুমে তোমার ঘরের দরজা খোলা ছিল; বোকা ওয়ার্ডার দরজার চাবীটা তাতে লাগিয়েই রেখেছিল; পাশাপাশি ঘরের সব দরজা-গুলোই একই চাবী দিয়ে খোলা যায়। সেই চাবী দিয়ে তুমি কার্ত্তি-কের ঘরের দরজা খুলে তাকে মেরে রেখে ফের নিজের ঘরে চলে' এসেছো। তোমায় সে দোষী বলেছিল বলে' এমনি করে' তুমি তার প্রাণ নিলে! জানো, তোমার এই কাজের জন্যে জেলার এবং ওয়ার্ডার-এর চাকরী ত যাবেই—আমারও চাকরীতে পর্য্যন্ত টান পড়তে পারে! তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তোমায় সুবিধে দিয়েছিলাম, তুমি এমনি করে' তার অপব্যবহার করলে?

বাহির হইয়া আসিলাম। ইহার পর তিনকড়ির সহিত আর আমার কথাবার্ত্তা হয় নাই।

পনেরো

কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার দিক হইতে সমস্ত ব্যাপার পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিল। যে জীবন নাট্যের আলেখ্য লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, এতদিন ছিলাম তাহার একজন প্রধান অভিনেতা, এখন হইতে তাহার দর্শক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেলাম। কথাটা খুলিয়া বলি——

জেলার ইন্‌স্পেক্টর প্রলয়েশ আমার কাজ-কর্ম্মে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার নামে উপরওয়ালার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিল ; তাহার উপর কার্ত্তিক খুন হইবার খবর পাইয়া কর্ত্তারা আমার উপর আগুন হইয়া উঠিলেন এবং ওয়ার্ডার ও জেলারের কার্য্যের গাফি-লতির জন্য আমাকে দায়ী করিলেন। তাহাদের চাকুরী গেল।

আমার উপর মিষ্ট-ভাষায় হুকুম আসিল—পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে।

এমনি যে ঘটিবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা অনুমান করিতেছিলাম এবং সে জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। পত্রের সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিলাম।

স্বোল

ছয়মাস পরে একদিন এক সমন পাইলাম,—তিনকড়ির মামলায় আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ছিলাম যাহার তদন্তকারী দারোগা, ছয়মাস পরে তাহারই সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াইলাম।

আমার পূর্ব্বে শঙ্কর চৌধুরী সাক্ষ্য দিতেছিল ; সে মল্লিকার সহিত আমার নাম জড়াইয়া আমাদের অবৈধ সম্বন্ধের প্রতি ইঙ্গিত করিল।

তিনকড়ি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল ; বলিয়া উঠিল—না হুজুর, ওর কথা মিথ্যে ! আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতাম না ; কিন্তু ওঁকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

আমি সাক্ষ্য দিতে উঠিলে, সরকার-পক্ষের উকীল প্রথমেই আমাকে ওই প্রশ্ন করিল ; অর্থাৎ, আমার সহিত মৃতার কোনরূপ অসঙ্গত সম্বন্ধ ছিল কি না। একবার মনে হইল সত্য কথাই বলি।

পরক্ষণেই ভাবিলাম, তাহা হইলে তিনকড়ির মনে অত্যন্ত আঘাত দেওয়া হইবে, আমার উপর তাহার এতদিনের বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে। থাক্, কাজ নাই সত্য কথা বলিয়া ; কী-ই বা ফল হইবে বলিয়া ?

কহিলাম—না। আমার সঙ্গে মৃতার কোন দিন কোনরকম অন্যায় সম্পর্ক ছিল না।

সরকার-এর উকিল তাঁহার বক্তৃতায় জ্বলন্ত ভাষায় হত্যার কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। প্রথমে মল্লিকার কথা, তারপর কার্তিকের কথা। বলা বাহুল্য, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি তিনকড়িকে হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন।

তিনকড়ির আত্মীয়গণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনিও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। বিচারে তিনকড়ির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইয়া গেল।

সন্ধ্যা

তাহার পর সুদীর্ঘ আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। চল-চ্ছায়ার মতো যে জীবন বহিয়া চলিয়াছে, তাহার অনেকেই আজ গত হইয়াছে ; অবশিষ্ট সকলে নিজেদের কৃতকর্ম্মের গুরুভার বহন করিয়া শ্রান্তপদে তাহাদের বাকী পথ অতিক্রম করিতেছে।

এই আট বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মল্লি-কার পিতা নীলমাধববাবুর মৃত্যু হইয়াছে। অরীন্দ্র তাহার সম্পত্তির প্রায় সমস্তই মদে এবং জুয়ায় নষ্ট করিয়া এখন স্ত্রীর নিকট হইতে মাসোহারা লইয়া দিনপাত করিতেছে ; শঙ্কর এবং বিমলা দেবী —এই দুইজনেই এখন তাহার বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করে। অরীন্দ্রের মনের সে প্রফুল্লতা গিয়াছে ; মুখের উপর তাহার নিবিড় অবসাদের ছাপ। তবুও মাঝে মাঝে আমার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে দামী একটি চুরুট সেবন করিতে করিতে বলে—ও হে, চল না

আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক ; অনেক দিন কোথাও যাই নি। সঙ্গে আছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা। যাবে ?

আমার ভিতরেও ভাঙন ধরিয়াছে। মনের শক্তি বহু পূর্ব্বেই হারাইয়াছি ; দেহের শক্তিও বুঝি যায়। মুখের ওপর জরার চিহ্ন দেখা দিতেছে ; কণ্ঠস্বরের সে সতেজ মিষ্টতা আর নাই···জীবন শেষ হইয়া গেছে।

সমস্ত অতীত আমার কাছে গতকালের মতো স্পষ্ট মনে হয়। তাহাকে আমি ভুলিতে পারি না ; দিন-রাত্রির সর্ব্ব সময়ে তাহা আমার চোখের সুমুখে ভাসিতে থাকে—তাহার প্রতিটি ঘটনা ;··· তাহার প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের পাপ-পুণ্যের কথা !

মাঝে মাঝে মল্লিকা-কে মনে পড়ে।—সেই মল্লিকা ! মন্দির-পথে পথের-বাঁকে তাহার সহিত সেই সাক্ষাৎটি আমি ভুলিতে পারি না। ইচ্ছা করে, তেমনি করিয়া আজ যদি তাহার সহিত তেমনি পথ চলিতে পারিতাম !

তিনকড়ি। বেচারী তিনকড়ি ! তাহার প্রতি আমার অন্তর অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরিয়া ওঠে। কল্পনায় তাহার সেই দুই রক্ত-মাখা হাত ধরিয়া তাহার প্রতি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করি, তাহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি·········

চলচ্ছায়া

এ জীবন ঝড়ের মতো দুর্ব্বার গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই ঝড়ের মুখে পড়িয়া যাহারা বিপর্য্যস্ত হইল, ধ্বংস হইল,—তন্দ্রাহীন গভীর রাত্রে তাহারা আমার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়···আমি ভীত হই না, চীৎকার করিয়া উঠি না ; শুধু অসহায়ের মতো তাহাদের পানে করুণ নয়নে তাকাইয়া থাকি।

পরিশিষ্ট

গল্প শেষ হইয়া গেল, এইবার আমি (অর্থাৎ সেই পত্রিকার সম্পাদক, যাহার কাছে প্রশান্ত ঘোষ তাহার লেখা রাখিয়া গিয়াছিল) পাঠকের সহিত আমার কথা শেষ করিব। পূর্ব্বাভাসে বলিয়াছি, বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে, প্রশান্তর গল্প আমার পত্রিকা 'বজ্রনাদ'-এ ছাপা হয় নাই ; তাহার কারণ এই যে, প্রশান্তর গল্প যে মাসে প্রেসে দিলাম, সেই মাস হইতে আমার পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায় ; কাজেই প্রশান্তর গল্প এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। তাহার সহিত আমার শেষবারের সাক্ষাতের পর আর প্রশান্তর দেখা পাই নাই ; তাহার পাণ্ডুলিপি আমার কাছেই ছিল। আজ এতদিন পরে (বোধ হয় বিশ বৎসর হইবে) তাহার সেই কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের ঠিক তিন মাস পরে একদিন বৈকালের দিকে প্রশান্ত আমার সাহিত দেখা করিতে আসিল।

ঘরে ঢুকিয়াই ঠিক তেমনি বিব্রতভাবে বলিতে লাগিল—আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। ক্ষমা করবেন। বল্‌ছিলাম কি, গল্পটি দেখেছেন? বিচারে কি আদেশ হল?

কহিলাম—হ্যাঁ, দেখেছি। বিচারে দোষী বলেই সাব্যস্ত করলাম; তবে, তাকে পুনরায় বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রশান্ত অপ্রস্তুতভাবে হাসিতে লাগিল:

—তা হলে তাকে কী ডাষ্ট্‌বিনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করলেন?

—না, অত কঠিন দণ্ড দেবার প্রয়োজন নেই। একটা সংশোধক ব্যবস্থা দিলেই হবে।

—ওর মধ্যে সংশোধন কর্‌বার কিছু কি আছে?

—হ্যাঁ আছে। তবে তা করতে গেলে পরস্পরের মধ্যে কয়েকটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাওয়া চাই!

কয়েক মিনিট উভয়েই নীরব হইয়া রহিলাম। মনের মধ্যে কী এক অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ পাইতে দিলাম না; কহিলাম—আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় আপনি বলেছিলেন যে, আপনার উপন্যাসের ঘটনাগুলি বাস্তব জীবন থেকে

নেওয়া হয়েছে ; সব ঘটনাই সত্যিকার ঘটেছিল। আপনার কথা সত্যি বলেই মনে করব ত ?

—নিশ্চয়। সমস্ত সত্যি। আপনি যদি আমার উপন্যাস পড়ে থাকেন, তা হলে বুঝবেন ওর মধ্যে আমিই নিজেকে বিনায়ক বলে পরিচয় দিয়েছি।

—অতএব আপনিই মল্লিকার সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন।

প্রশান্ত হাসিল ; মনে হইল, তাহার মুখ যেন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল :

—হ্যাঁ, তার জন্যে আমার শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কে কার শাস্তি দেয়, তার ত ঠিক নেই ; কাজেই···

কহিলাম—তা বটে, কে কার শাস্তি দেয় তার ঠিক নেই ; কাজেই আপনাকে কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করল না।

প্রশান্ত মুখ নীচু করিয়া পিরাণের বোতাম ঠিক করিতে লাগিল।

কহিলাম—হ্যাঁ। গল্পের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন করতে চাই— অবশ্য তা আমি করব আপনার অনুমতি নিয়েই।

—বলুন, কী পরিবর্ত্তন করতে চান।

—একটি অত্যন্ত মূল ঘটনা পরিবর্ত্তন করতে চাই। এর মধ্যে সবি আছে, কিন্তু যে প্রকৃত দোষী কেবল সে-ই নেই। তাকেই আমি উপস্থিত করতে চাই।

প্রশান্ত বড় বড় চোখে আমার পানে চাহিল :

—কী বলছেন আপনি, আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না।

কহিলাম—তিনকড়ি কারুকে খুন করে নি।

—সে কি !!

—না, তিনকড়ি প্রকৃত অপরাধী নয়।

—হতে পারে। হয় ত বিচারক ভুল করে তিনকড়িকে শাস্তি দিয়েছেন। তা হলে আপনি বলতে চান যে, তদন্ত করবার সময় আমি ভুল করেছিলাম।

—হ্যাঁ, আপনি ভুল করেছিলেন এবং ইচ্ছে করেই ভুল করেছিলেন।

—ক্ষমা করবেন, আপনার কথা বুঝলাম না। আপনার মতে তা হলে প্রকৃত অপরাধী কে ?

—আপনি।

আমার কথা শুনিয়া যেমন করিয়া প্রশান্ত আমার পানে তাকাইল, তেমন দৃষ্টি আমি আর কাহারো চোখে কখনো দেখি নাই ! প্রথমে সে দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইল বিস্ময়, তারপর ভয়, তারপর আমার প্রতি, মানুষের প্রতি এবং সমস্ত জগতের প্রতি সকৌতুক অবজ্ঞা !

কহিলাম—দু'জনকেই আপনি খুন করেছেন !

প্রশান্তর দৃষ্টি দেওয়ালের ছবির প্রতি নিবদ্ধ ; তাহার মুখে মৃদু হাসি ; কহিল—আপনি যে আবিষ্কার করেছেন, তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আপনার গলা কাঁপছে কেন ? আপনার মুখ যে সাদা হয়ে গেছে, কী নার্ভাস্ লোক আপনি !

প্রশান্ত তাহার দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিল এবং অল্প একটু হাসিয়া কহিল—কেমন করে এ ধারণা আপনার মাথায় এলো, তা জান্‌তে ভারী ইচ্ছে করছে ! আমি কী গল্পের মধ্যে তেমন স্পষ্ট আভাস কিছু দিয়েছি ? মনে ত হয় না। দয়া করে বলুন।

কহিলাম—আপনি হত্যাকারী ; এবং সে সত্য আপনি অন্ততঃ আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি।

—বটে ? বলুন শুনি, ভারী আগ্রহান্বিত হচ্ছি।

—আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন, শুনুন ।

উত্তেজিতভাবে টেবিল হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কয়েক মিনিট পরে বলিলাম—কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

—বলুন।

—প্রথমে আমায় বলুন, পিক্‌নিক্‌-পার্টি থেকে আপনি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন ?

—গল্পে সে কথা ত লেখা আছে। আমি বাড়ী গেলাম।

—কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে গেলেন, সে-কথা কেটে দিয়েছেন। আপনি কি বনের মধ্যে দিয়ে জান নি ?

—হ্যাঁ। তাই গিছলাম।

—সুতরাং, বনের মধ্যে আপনার সঙ্গে মল্লিকার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল।

—তা ছিল।

—তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল।

—না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। পরে হাসিয়া বলিল—কি করে সাক্ষীকে ক্রস্ করতে হয়, তা আপনি মোটেই জানেন না।

বলিলাম—তা জানি না বটে। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনকড়ির চেয়ে মল্লিকার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াই বেশী সম্ভব ছিল; কারণ, তিনকড়ি জান্‌ত-ই না যে, মল্লিকা ওই বনের মধ্যে আছে; আপনি কিন্তু খুব ভালো করেই জানতেন এবং তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই বনের মধ্যে দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। তারপর বাড়ী ফিরে এসে আপনি যে শুধু শুধু অমন ভীত ত্রস্ত বোধ করতে লাগলেন, তার কারণ কী? পাগলের চীৎকার ত রোজই শোনেন, কিন্তু সে রাত্রে শুনে অতখানি শিউরে উঠ্‌লেন কেন? আমার মনে হয়, নিজের কাজ স্মরণ করেই আপনি অতখানি ভয় পাচ্ছিলেন। তারপর যখন সে রাত্রে আপনি অরীন্দ্রের বাড়ী গেলেন, তখন সেখানে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ করে না দিয়ে, আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করতে লাগলেন। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী-ই আপনার মতো অমন উদাসীন-ভাবে অতবড় জটিল একটা হত্যার তদন্ত করত না। আপনি জান্‌তেন—হত্যাকারী কে; তাই আপনার অত উদাসীনতা। তারপর মল্লিকা কিছুতেই হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করল না—কারণ, সে হত্যাকারী তার প্রিয়। তিনকড়ি অপরাধী হলে নিশ্চয় সে তার নাম প্রকাশ করে দিত; কারণ তিনকড়ির ওপর মল্লিকার কোন মমতা ছিল না। বিনা-কারণে

সে অরীন্দ্রের কাছে তিনকড়ির নামে তার প্রতি নিষ্ঠুরতার মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে ; আর সত্যি সত্যিই সে যদি তাকে খুন করত, তা হলে নিশ্চয় মল্লিকা তার নাম গোপন করত না। মল্লিকা আপনাকে ভালবাস্ত, তাই, জেনে-শুনেও সে আপনার নাম প্রকাশ করে নি। তারপর মৃতপ্রায় মল্লিকার কাছে গিয়ে যত অবান্তর প্রশ্ন করে আপনি যে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন, এ ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন এই জন্যে যে,—যাতে বিলম্বে মল্লিকার বাক্‌শক্তি লোপ পায় এবং হত্যাকারীর নাম সে না প্রকাশ করতে পারে।

আমি থামিতেই প্রশান্ত কহিল—বলুন, থামলেন কেন ?

—তারপর আপনার তদন্ত ; সে ত এক অক্ষম এবং অসার্থক অভিনয়। ঠিক-মতো কিছুই তদন্ত করলেন না, এবং তার জন্যে পরে আপনাকে প্রলয়েশের রিপোর্টের জোরে চাকরিটি খোয়াতে হয়েছিল। প্রথমেই আপনার ঘটনাস্থলে গিয়ে সেখানে যারা যারা ছিল, তাদের পরীক্ষা করা উচিত ছিল—তা আপনি করলেন না ; কারণ, তা করতে গেলে, হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনি যে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

—বলুন, বলুন।

—যা বললাম এই কী যথেষ্ট নয় ? তারপর কার্ত্তিকের কথা। প্রথমটা তার মনে পড়ে নি, কিন্তু শেষের দিন সে ঠিক মনে করতে পেরেছিল যে, আপনিই তার জামায় হাত মুছে ছিলেন। সে সেই কথাই বলতে এসে ইতস্তত করছিল ; আপনি বুঝতে পেরে, রাগা-

ন্বিত হয়ে তাকে সুমুখ থেকে সরিয়ে দিলেন। অপরাধী না হলে, অন্য কোন দারোগাই হাতের কাছে সাক্ষী পেয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে না নিয়ে রেগে উঠে তাকে তাড়িয়ে দিত না। তারপর যখন কার্ত্তিক হত্যাকারী-কে চিন্‌তে পারুলে, ঠিক সেই সময় তিনকড়িকে আপনি ঘরের বাইরে বেড়াবার অধিকার দিলেন,—তার আগে নয়। আপনি চেয়েছিলেন, রাত্রে তিনকড়ির ঘর খোলা থাক; অর্থাৎ, আপনি কার্ত্তিককে হত্যা করলেও, সে দোষটা যাতে সহজেই তিনকড়ির ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। আপনি স্থির জানতেন, ইন্‌সপেক্‌টারের কাছে কার্ত্তিক আপনার নাম করত; তাই তাকে অমন ভাবে হত্যা করে তিনকড়ির কাঁধে দোষ চাপালেন।

প্রশান্ত কহিল—যথেষ্ট হয়েছে, আর না। যে রকম উত্তেজিত হয়েছেন, হয় ত এখুনি ফেন্ট্‌ হয়ে পড়বেন। স্থির হয়ে বসুন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমিই ওদের দু'জনকে হত্যা করেছি।

ইহার পর বহুক্ষণ অবধি দুই জনেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রশান্ত কহিল—আপনি সৌভাগ্যক্রমে ধরতে পেরেছেন, কিন্তু আর কেউ বোধ হয় পারবে না। অন্য সকলে নিশ্চয় আমার তদন্তের প্রশংসাই করবে।

কথা বলিলাম না। একটু থামিয়া প্রশান্ত বলিতে লাগিল—তারপর আট বছর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ আট বছর ধরে এই ভয়ঙ্কর গোপন কথাটি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছি;—কিন্তু আর পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে—সবিস্তারে এ কথা জগতের লোক-কে না জানালে আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে জানুক যে, আমি একজন সাধারণ লোক নই। আমার কাছ থেকে তারা জীবনের একটা ভীষণ সত্য অবগত হোক্—এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই গল্প লিখেছি। প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে আমি ইঙ্গিত সাজিয়ে রেখে গেছি; তবুও যদি পাঠক প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না পায়, সে তাদের নির্ব্বুদ্ধিতা। কিন্তু এইবার আমি উঠবো। বাইরে গাড়িতে একজন আমার অপেক্ষা করছেন।

বলিলাম—এক মিনিট। গ্রন্থকার কেন যে হলেন, তা ত বুঝলাম; কিন্তু, কখন, কেমন ক'রে এবং কেন যে খুন করলেন—তা ত বুঝলাম না।

—কখন করলাম এবং কেমন করে করলাম, সে ত আমার রিপোর্টের মধ্যেই লিখে রেখেছি। কেন করলাম? বাস্তবিক, কেন করলাম? না করলেও ত পারতাম! খুন করলাম রাগের বশে। অত্যধিক ক্রোধে আমার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। মল্লিকার প্রতি হিংসায়, রাগে, বিদ্বেষে আমার মাথা গোলমাল হয়ে গিছলো। তাই যখন বনের মধ্যে ঢুকে আবার তাকে দেখতে পেলাম, তখন ভেবেছিলাম তাকে আরও কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবো। শেষ অবধি দেখলাম, তার নিজেরই

অস্ত্র তার বুকে বসিয়ে দিয়েছি। আপনি অমন করে মুখ বিকৃত করছেন কেন? আমার প্রতি ঘৃণা বোধ করছেন?

কহিলাম—হ্যাঁ, আপনাকে আমি দৃষ্টির সাম্‌নে সহ্য করতে পাচ্ছি নে। মাপ করবেন।

—এ ত স্বাভাবিক। সময় সময় আমি নিজেই নিজেকে সহ্য করতে পারি না। আচ্ছা, এইবার উঠলাম। ভালো কথা,—কুমার বাহাদুরকে দেখবেন?—কুমার অরীন্দ্রজিৎ রায়-কে? তিনি নীচে গাড়ীতে বসে আছেন। ওই যে।

উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া নীচের দিক দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, হুড্ খোলা একটা মোটরের উপর একটি কৃশকায় লোক বসিয়া আছে; তাহার আকৃতি এবং পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে সেই সৌখিন কুমার-বাহাদুর বলিয়া চেনা শক্ত।

প্রশান্ত কহিল—চল্‌লাম, নমস্কার।

তাহারা দুইজনে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। জানালার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদেরি বিচিত্র জীবনের বিচিত্রতর কাহিনীর কথা ভাবিতে লাগিলাম।

অজ্ঞাতবাস

এক

মানুষের মনস্তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা বড় বড় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—মানুষের হঠাৎ কোন অস্বাভাবিক আচরণের জন্য শুধু বর্ত্তমান স্থান-কাল-পাত্র এবং সাময়িক উত্তেজনাই দায়ী নয়, যথার্থ হেতু খুঁজিতে গেলে অতীতের ছোট বড় অনেক ঘটনার সহিত তাহার একটা অচ্ছেদ্য যোগ দেখা যায়।

সেই জন্য, সেদিন বন্ধু জ্যোতিষের সামান্য পরিহাসের উত্তরে অরবিন্দ যখন তাহাকে রূঢ় ভাষায় অপমান করিয়া বসিল, তখন জ্যোতিষ ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে অরবিন্দের সহসা এইরূপ অপ্রত্যাশিত অভদ্র আচরণে বিস্মিত হইয়া গেল ;—তাহার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। কথাটা খুলিয়া বলি।

চলচ্ছায়া

অরবিন্দ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। এক আত্মীয়ের বিশেষ সাহায্যে বিলাত হইতে 'অ্যাকাউন্‌টেন্সি' পাশ করিয়া আসিয়া এখানকার কোন-এক সওদাগরি আফিসে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দের মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার কলিকাতার জল-বায়ু অস্বাস্থ্য-কর বোধ হওয়ায় তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া কর্ম্মাটারে বাড়ি ভাড়া করিয়া, বারোমাস সেখানেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; বারেকের জন্যও আর কলিকাতায় পদার্পন করিলেন না। বিলাত যাইয়া অরবিন্দ সাহেব বনিয়া গিয়াছিল; হ্যারিসন রোড অঞ্চলে একটা হোটেলের ত্রিতলের একটি সম্পূর্ণ 'ফ্ল্যাট্' লইয়া থাকিত; এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহের শেষেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিত।

বিলাত-ফেরৎ-সমাজে মেলা-মেশার সময়ে কেদার মিত্র মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে; এবং পরে তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া কেদারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী মীরার সহিত আলাপ হয়। সে আলাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া দুই জনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বন্ধনের আয়োজন ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। শুভ-খবরটা অনতিবিলম্বে সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গত কল্য অরবিন্দ আফিসের পর বাড়ি ফিরিতেছিল, ট্রামে তিন চার জন বাল্য-বন্ধুর সহিত দেখা। তাহাদের মধ্যে সতীশ তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া উঠিল—আরে, অরবিন্দ নাকি? ওঃ, অনেক দিন বাদে দেখা! তারপর; শুনলাম নাকি, মস্ত এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করছিস! সত্যি? ওঃ, তোর খুব "জোর-বরাৎ" বলতে হবে!

কথা-গুলো অরবিন্দের কানে অতিশয় বিশ্রী ঠেকিল,—টাকার জন্যই সে কি মীরাকে বিবাহ করিতেছে নাকি? সতীশটা একটা ইডিয়ট্, সবাই হয়ত উহার কথা সত্য বলিয়া ভাবিয়া লইল। মনে মনে বিরক্ত হইয়া অরবিন্দ বাড়ী ফিরিল!

সেদিন ছিল রবিবার। বহুদিন পরে অরবিন্দ বৈকালে তাহাদের ক্লাবে গিয়াছিল। সেখানেও ওই এক কথা,—অরবিন্দ অত্যন্ত ভাগ্যবান্; প্রচুর পয়সা-ওলা লোকের একমাত্র মেয়েকে সে বিবাহ করিতেছে, এখন আর তাহাকে পায় কে, ইত্যাদি! অরুণ রায় অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—হ্যাল্লো ওল্ড্ চাম্! কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্! মিস্ মিত্রের সাত-লাখ টাকার বিষয় তুমি সাতশো বছর ধরে ভোগ কর; আমার কিন্তু যেন একপাত লুচি থেকে বঞ্চিত না হই—বুঝেছ, ইউ লাকি ডগ্!

উপস্থিত আরও অনেকেই অরবিন্দের ভাবি-পত্নীর অগাধ ধন-সম্পত্তির বিষয় অনেক টিকা টিপ্পনি করিল।

অরবিন্দ মনে মনে তাহাদের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; কেন, সে কি এতই হীন যে কেবল-মাত্র টাকার লোভেই সে

মীরাকে বিবাহ করিতেছে; টাকাটাই কি তাহার চরম লক্ষ্য? ...গায়ের রাগ গায়ে মাখিয়া অরবিন্দ বাড়ি ফিরিল।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল, কথামত জ্যোতিষ এবং আরও দুই জন বন্ধু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কথা ছিল, সন্ধ্যার পর অরবিন্দ এবং জ্যোতিষের মধ্যে বাজী রাখিয়া ব্রীজ খেলা হইবে। এরূপ বাজী রাখিয়া খেলা পূর্ব্বেও বহুদিন হইয়াছে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম হইতেই অরবিন্দ হারিতে লাগিল। শেষে, দুই ঘণ্টার ভিতর যখন সে পাঁচশো টাকার উপর হারিয়া গেল তখন বিজয়ী জ্যোতিষ অরবিন্দকে বলিল—থাক, আজ আর খেলে দরকার নেই। তুমি আজ মন দিয়ে খেল্‌ছ না, আরও হারবে।

খেলা বন্ধ হইল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া অন্য বন্ধু দুই জন প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; মুষল-ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

অরবিন্দ মুখ বিকৃত করিয়া হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল —আজ বড্ড হেরে গেছি। আচ্ছা, আর একদিন এর শোধ নেব!

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল—পাঁচশো-টাকা হারা তোমার কাছে বড্ড হারা হল! তোমার মত যদি একজন মিলিওনেয়ার ওয়াইফ্ পেতুম তাহলে আমরা গ্রাহ্যই করতুম না। মীরা মিত্র শুনেছি—

তাহার এই কথা যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিল। অরবিন্দের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এতক্ষণে ফাটিয়া পড়িল; চিৎকার করিয়া কটুকণ্ঠে বলিল—শাট্ আপ্! যত সব মীন্ মাইণ্ডেড্ লোফার্স্! তোমরা ভাব কি আমি এতই নীচ যে, কেবল মাত্র তার টাকার লোভেই তাকে বিবাহ করছি!

সহসা তাহার এরূপ অভদ্র কথায় জ্যোতিষ বিস্মিত হইয়া গেল, মনে করিল—অতগুলো টাকা হারিয়া গিয়া অরবিন্দের মাথা খারাপ হইয়া গেছে। তাই নরম স্বরে বলিল—বাঃ! কিই বা বল্লুম? তুমি যে শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ!

ক্রোধে অন্ধ হইয়া অরবিন্দ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছে, তীব্র কণ্ঠে বলিল—বেশ করব রাগ করব। বেরিয়ে যাও এক্ষুণি আমার ঘর থেকে; ভদ্র মহিলার নাম মুখে আনবার আগে উপযুক্ত হও, তারপর এসো।

জ্যোতিষ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অপমানে তাহার চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; শ্লেষ-যুক্ত কণ্ঠে বলিল—বেশ, আমি না হয় যাচ্ছি; কিন্তু তুমি যে কেবল টাকার লোভেই কেদার মিত্রের ভাইঝিকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছ—এ কথা তো কারুর অজানা নেই। যাক্, বৌয়ের পয়সায় এইবার দিনকতক খুব নবাবী করে নাও; চিন্তা নেই, তোমার মোসায়েবি করতে আসব না।

জ্যোতিষের কথা শুনিয়া অরবিন্দের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইল। সে একটা অস্ফুট ক্রুদ্ধ চিৎকার করিয়া অদূরে টেবিলের

উপর হইতে ব্যায়াম করিবার একটা স্প্রীং ডাম্বেল তুলিয়া লইয়া জ্যোতিষের দিকে তাহা সজোরে নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গেল !

নিক্ষিপ্ত লৌহ-খণ্ড সজোরে গিয়া জ্যোতিষের কানের পাশে কপালের উপর পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্দ্ধ-উচ্চারিত আর্ত্তনাদ করিয়া জ্যোতিষ মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মত একটা গাঢ় স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। বন্ধ দরজার বাহিরে অজস্র ধারায় বারিপাতের শব্দ তখন পৃথিবীর আর সমস্ত কোলাহলকে ডুবাইয়া দিয়াছে !

মিনিট কতক হতচেতনের মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর অরবিন্দ আপনাতে-আপনি ফিরিয়া আসিল ; পরক্ষণেই, ভূমিতলে রক্তাক্ত জ্যোতিষের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল ; দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। নীচু হইয়া জ্যোতিষের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অরবিন্দ ডাকিল —জ্যোতিষ ; জ্যোতিষ ! কোন সাড়া পাইল না ; ক্ষিপ্র গতিতে তাহার বুকের উপর হাত রাখিল—কি সর্ব্বনাশ ! কোন স্পন্দন নাই ; হৃদ-যন্ত্র বন্ধ হইয়া গেছে !!

একি হইল ! মুহূর্ত্তের ভ্রমে সে এ কী অমানুষিক কাজ করিয়া

ফেলিল; সে নরহত্যা করিল! এ পাপের শাস্তি তাহাকে শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে। কাল প্রভাতেই সমস্ত জগত তাহার এই ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে এবং পুলিস আসিয়া তাহাকে নর-হন্তা বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। তার পর——??

অরবিন্দ ত্বরিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে পালাইবে। যতদূর হয়, যেখানে হয়, রাত্রির অন্ধকার এবং এই ভীষণ দুর্য্যোগ আশ্রয় করিয়া সে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিবে। একবার সে তাহার পায়ের তলায় নিথর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল—পরক্ষণেই ঘরের কোন হইতে লাঠি-গাছটা টানিয়া লইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সেই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

কোথায় যে যাইবে, তাহার কোন ঠিক নাই; উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিস্কের মধ্যে তাহার চিন্তা করিবার শক্তি তখন লোপ পাইয়াছে। বিহ্বলের মত সে চলিতে লাগিল। সহসা সম্মুখে একখানা ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ডাকিয়া অরবিন্দ তাহার উপর উঠিয়া বসিল। কোথায় যাইতে হইবে—ট্যাক্সি-চালক দুই তিন বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর অরবিন্দের মুখ দিয়া বাহির হইল—"বারাকপুর"।

গাড়ি ছুটিল।

দুই

এতক্ষণে হয়ত চাকরটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে খবর দিয়াছে ; ম্যানেজার হয়ত এতক্ষণে পুলিসে 'ফোন' করিয়াছে ; পুলিস আসিয়া এতক্ষণে হয়ত হত্যা-কারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে……

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল বলা যায় না, সহসা অরবিন্দের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ড্রাইভার হাঁকিল—বারাকপুর আ-গিয়া হাজুর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়া গেল। অরবিন্দ চকিত হইয়া উঠিয়া গাড়ি হইতে নামিল, এবং পকেট হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া চালকের হাতে দিল।

—চেঞ্জ তো নেই হায় হাজুর ; লেকেন্……

—আচ্ছা আচ্ছা ; লে লেও তোম্—

অরবিন্দ রাস্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইল। অন্ধকারে দিক্-ভ্রান্তের মতো সে যে কোথায় যাইতেছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া অদূরে একটি বাড়ির একতলার

ঘরের জানালা দিয়া আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়া সে সেই দিকেই চলিল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্যই এই দুর্যোগের রাত্রে কেহ ওই আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছে!

বাড়ির নিকটে গিয়া অরবিন্দ দেখিল, সুমুখের গেট্ উন্মুক্ত; সে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিছু দূরে নীচের যে-ঘরের জানলা দিয়া আলোর রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল সেই ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অরবিন্দ দেখিল—ভিতরে একজন লোক টেবিলের সম্মুখে কেদারার উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। অরবিন্দ বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল—মশায়, আমি বড় বিপন্ন; অনুগ্রহ কোরে যদি একটু আশ্রয় দেন; আজ রাত্রের মত—

ভিতরের গৃহস্বামী নড়িল না; তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া রহিল।

অরবিন্দ সাহস করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—শুনছেন!

সহসা গৃহস্বামী চকিত হইয়া তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত করিলেন—যেন ধ্যান সমাপ্ত করিয়া আত্মস্থ হইলেন; তারপর অরবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর আদেশের সুরে বলিলেন—বসুন···। অরবিন্দ দ্বিরুক্তি না করিরা সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

অরবিন্দ দেখিল—তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট লোকটি লম্বা এবং রোগা ; মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করা শক্ত—পঁয়ত্রিশ হইতে পঁচাত্তরের ভিতর যে-কোন একটা হইতে পারে। সকলের বেশী অরবিন্দকে আকৃষ্ট করিল—তাঁহার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটা ; তাহাদের ভিতর হইতে কিসের যেন একটা জ্যোতি অনুক্ষণ বাহির হইতেছে। সেই তীব্র চোখের অতলস্পর্শী দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে অরবিন্দের মনের উপর অনতিক্রমনীয় প্রভাব বিস্তার করিল।

গৃহস্বামী পূর্ব্বের ন্যায় জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আমার নাম ডাক্তার অগ্নিবাহন রুদ্র ; আমি এ বাড়ির মালিক। তারপর, তুমি কে ? কি জন্যই বা এমন অসময়ে আমার বাড়ির ভিতর এসে ঢুকেছ ?

অরবিন্দ বুঝিল—যাহার নিকট সে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে সে বড় সাধারণ লোক নয়। সেজন্য সে-ও তাহার কথাবার্ত্তায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল ; বলিল—কে আমি, তা জেনে আপনার কোন লাভ নেই। আমি কলকাতা থেকে আসছি। আপনার বাড়ির দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি—

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—বাজে কথায় লাভ নেই। তোমার মুখ দেখে তোমায় বিশেষ বিপদগ্রস্থ বলে মনে হচ্ছে। নিজে থেকে সব কথা যদি খুলে না বল তাহলে এখুনি পুলিস ডাকব। তখন হয় ত অনেক সাংঘাতিক কথাই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অরবিন্দ মনে মনে চমকিয়া উঠিল ; মুখ তুলিয়া দেখিল—গৃহ-

স্বামী এক-দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে ; সে দৃষ্টির অন্তরালে সে কী সন্মোহনী শক্তি !—অরবিন্দ চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না।

সহসা সে চলিয়া যাইবার মনস্থ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল ; পারিল না। কি এক অনির্দ্দেশ্য শক্তির প্রভাবে তাহার সকল ক্ষমতা যেন লুপ্ত হইয়া গেছে।

গৃহস্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—মিথ্যা চেষ্টা ; পারবে না। তার চেয়ে বরং বলেই ফেল—হয়ত আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি।

অরবিন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অসম্ভব ! আমার জন্যে কিছুই করতে পারবেন না।

—সেটা পরে দেখা যাবে। দেখতেই তো পাচ্ছ, কিছু ক্ষমতা আমার আছে। নাও, এখন বল,—তোমার নাম কি ?

—অরবিন্দ রায়।

নাম শুনিবামাত্র গৃহস্বামীর মুখ পলকের জন্য কিসের উত্তেজনায় রাঙা হইয়া উঠিল ; তিনি নিজের মনে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিয়া উঠিলেন। তারপর, পুনরায় অরবিন্দের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—বল···

নিজের কৃতকর্ম্মের কথা গোপন করিয়া রাখিবার জন্য অরবিন্দ অন্তরের মধ্যে প্রাণপন চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না ;—কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করিয়া সকল কাহিনী তাহার অপরিচিত শক্তিমান গৃহস্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার রুদ্র নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অরবিন্দ কাতর-কণ্ঠে কহিল—আমাকে কি আপনি পুলিসে ধরিয়ে দেবেন ?

—না না ; আমি তোমায় রক্ষা করব। সেই চিন্তাই করছিলাম।

—কেমন কোরে আমায় পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবেন ?

—সেটা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে তোমায় আমার জীবন কাহিনী শুনতে হবে। সে-সব কথা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে, কি কোরে তুমি আমার রূপ ধারণ কোরে সকল বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

অরবিন্দ সবিস্ময়ে বলিল—আপনার রূপ ধারণ করব ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারপর এমন জায়গায় তোমায় লুকিয়ে রাখব, যেখান থেকে বিশ্বের কোন লোক তোমায় খুঁজে বার করতে পারবে না। মানুষের চোখ থেকে তুমি অদৃশ্য হোয়ে যাবে।

—দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলছেন ?

ডাক্তার হাসিয়া বললেন—না না ; এইখানে এই কলকাতাতেই থাকবে ; বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে ; যেমন ইচ্ছে তেমনি জীবন যাপন করবে—অবশ্য যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

অরবিন্দ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল—কি আপনার প্রস্তাব—আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

—পারবেও না, যতক্ষণ না আমার জীবনের সমস্ত কথা শোন।

—বলুন আপনার জীবন-কাহিনী, আমি শুনতে প্রস্তুত।

তিন

ডাক্তার অগ্নিবাহন বলিতে আরম্ভ করিলেন—

আমার জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস জগতের কোন লোকই আজ পর্য্যন্ত জানে না ; আজ প্রথম তোমার কাছে বল্‌ছি, তার কারণ যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও তাহলে আমার জীবনের সকল কথাই তোমার জানা একান্ত আবশ্যক।

আমার কি জাত, তা অনেকেই ঠিক করতে পারে না ; কারণ আমি অনেক রকম ভাষা ব্যবহার করতে পারি এবং ভারতবর্ষের সকল দেশ ঘুরে ঘুরে আমাকে কোন বিশেষ প্রদেশের অধিবাসী বলে মনে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে আমার দেহে মিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার বাবা বাঙ্গালী ; কিন্তু আমার মা ছিলেন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা। আমার মাতামহ ছিলেন, কাশীর একজন বিখ্যাত সাধু-পুরুষ। বাবা যখন চাকরী করতে কাশী যান সেই সময়ে একদিন স্নানের ঘাটে মাকে দেখতে পেয়ে তাঁর রূপে মুগ্ধ হন। পরে বাবা আমার ভবিষ্যত মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন;

কিন্তু তিনি এ বিবাহে সম্মতি না দেওয়ায় একদিন রাত্রে মাকে নিয়ে বাবা কাশী পরিত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিল মাতামহের দীর্ঘ সঞ্চিত টাকার বাক্স এবং তাঁরই একজন ধূর্ত্ত চাকর—লালচাঁদ।

বাবা হায়দ্রাবাদ রাজ-সরকারে চাকরী পেয়ে, সেখানে চলে যাবার কিছুদিন পরেই, মা আমাকে চারদিনের শিশু রেখে ইহ-লোক পরিত্যাগ করেন এবং তার কয়েকদিন পরেই সহসা বাবাও মারা যান। ডাক্তারেরা বলে, বিষ প্রয়োগের ফলে বাবার মৃত্যু ঘটে, এবং, মনে হয়, এ বিষয়ে লালচাঁদের বিশেষ হাত ছিল।

যাই হোক, লালচাঁদ আমাকে এবং বাবার টাকাকড়ি যা কিছু ছিল, সঙ্গে নিয়ে কাশীতে ফিরে আসে। আমাকে মাতামহের কাছে গচ্ছিত করে দেয়; টাকাকড়ি অবশ্য নিজের কাছেই রেখে-ছিল। মাতামহ আমাকে অগ্নিশুদ্ধ কোরে নিয়ে গ্রহণ করেন। লালচাঁদ সজ্ঞানে জঘন্য কাজে লিপ্ত হোয়ে মুসলমানের দেশে গিয়ে অন্নগ্রহণ করেছিল ব'লে, তাকে জাতিচ্যুত কোরে কাশী থেকে বার কোরে দেওয়া হয়। বার বৎসর সন্ন্যাসী হোয়ে সাধনা করলে তবে সে তার পাপ থেকে মুক্ত হোয়ে আবার কাশীতে ফিরতে পারবে।

প্রথম প্রথম আমাকে মাতামহ অত্যন্ত বিষ-চক্ষে দেখতেন; কিন্তু ক্রমশঃ তিনি আমাকে ভালবাসতে লাগলেন এবং ছ'মাসের মধ্যে আমি তাঁর দিবারাত্রের সঙ্গী হোয়ে উঠলাম। আমার মাতামহ ভারতবর্ষের মধ্যে একজন বিখ্যাত যোগ-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; যোগবল, শব-সাধনা প্রভৃতি তন্ত্র-বিদ্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেই সব গভীর রহস্যময় বিদ্যায় দীক্ষিত হোতে লাগলাম, এবং আমার দেহকে উপবাস-অনশন প্রভৃতি কঠোর কৃচ্ছ-সাধনের বশবর্ত্তী কোরে ক্রমে ক্রমে আমার সূক্ষ্ম-দেহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলাম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই মাতামহ সহসা লোকান্তরিত হলেন, এবং আমার অন্যান্য সতীর্থরা আমার প্রতি হিংসা-পরবশ হোয়ে আমায় নিধন করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমার জ্ঞানের প্রভাবে আমি তাদের সেই দুরভিসন্ধি জানতে পেরে কাশী থেকে পালিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

আমার জীবনের এই সন্ধি-ক্ষণে লালচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। বারো বৎসর যোগ অভ্যাস কোরে সে কাশীতে ফিরে এসেছিল। তারই কৃপায় আমি সে যাত্রা আমার শত্রুদের মারণ-যজ্ঞের কবল থেকে রক্ষা পাই।

লালচাঁদ আমায় শিশু-অবস্থায় মানুষ করেছিল বলে আমার

প্রতি তার যে একটা প্রবল স্নেহ ছিল, সেই স্নেহের বশেই সে আমাকে তার শিষ্য কোরে নিয়ে তার জ্ঞানের পরম-তত্ত্বে আমায় দীক্ষিত কোরে তুলল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই, সম্মোহন-বিদ্যা, মৈস্মর-তত্ত্ব, অনুপ্রবেশ প্রভৃতি যাবতীয় গুপ্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হোয়ে আমি যোগ সাধনা করতে লাগলাম। তখন আমি ইচ্ছা করলেই এই মাটির দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম, আমার সূক্ষ্মদেহ যেখানে খুসী, দেশ দেশান্তরে পাঠিয়ে দিতে পারতাম ; ইচ্ছা হলেই দেবতার মত ধ্যানের রাজ্যে স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করতাম।

স্বেচ্ছায় বহুদিন আগেই আমি আমার এই কৃমি-কীট-ভরা খোলসটাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ কোরে চলে যেতাম, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম আমাকে বাধা দিত। আমার মৃত্যুর সময় তখনো আসে নি, সেজন্য আমায় পুনরায় এই দেহের মধ্যে আশ্রয় হত।

একটা রহস্য লালচাঁদ আমাকে জান্‌তে দেয় নি—কেমন কোরে একজনের আত্মা অপরের দেহে চালনা করা যায়। আমি দেখেছি, আমার গুরু লালচাঁদ তার দেহ ছেড়ে একটা মৃত-দেহে প্রবিষ্ট হয়েছে ; তার দেহটা মড়ার মতো হোয়ে পড়ে রইল কিন্তু সেই মৃতদেহ লালচাঁদের আত্মার প্রভাবে জীবন্ত হোয়ে উঠে চলা-ফেরা করতে লাগল। লালচাঁদ আমাকে এই বিদ্যা শেখ্‌বার অযোগ্য মনে করাতে আমি দৃঢ়-সংকল্প হোয়ে তিব্বতে চলে যাই ;

সেখান থেকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হোয়ে ফিরে এসে দেখি লালচাঁদের শেষ সময় উপস্থিত। সে আমার জ্ঞান-লিপ্সা দেখে সন্তুষ্ট হোয়ে শেষ গূঢ়তত্ত্ব আমার কানে বলে দিয়ে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলে।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার নব-লব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করলাম ; নিজের আত্মাকে লালচাঁদের প্রাণহীন দেহে চালনা করলাম। পরীক্ষা সফল হল—লালচাঁদের দেহ অবলম্বন কোরে আমি উঠে বেড়াতে লাগলাম এবং আমার নিজের দেহ নিষ্পন্দ হোয়ে মাটীতে পড়ে রইল। যাই হোক, আবার নিজের দেহে ফিরে এসে, লালচাঁদের মৃত দেহের সৎকার কোরে আমি কাশী পরিত্যাগ করলাম। সঙ্গে ছিল—মাতামহের প্রভূত ধন-সম্পত্তি।

আজ বছর দুই হ'ল কলকাতায় এসে অনেক অনুসন্ধান কোরে এই বাড়িখানা কিনেছি, আমার অনন্যসাধারণ জীবন যাপনের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধা-জনক বাড়ি আর পেলাম না। লোকজনের মধ্যে বামুন-চাকর জন তিন-চার আছে, আর আছে পঞ্চানন নন্দী বলে' আমার একজন সরকার। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত—আমার সব কাজই সে করে ; বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনার ভারও তার ওপর ; লোকটি খুব কর্ম্মঠ এবং অতিশয় ধূর্ত্ত।

এই নিরালা বাড়িতে বসে আমি ইচ্ছামত বহুদিন পর্য্যন্ত আমার দেহ ছেড়ে উর্দ্ধে চলে যাই—অসীম অনন্তের মধ্যে বিচরণ করতে করতে কত আশ্চর্য্য দৃশ্য, কত অদ্ভুত স্বপ্ন, কত অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ করি। শুধু, দুঃখ এই যে, প্রকৃতির নিয়মাধীন হোয়ে আবার আমাকে এই জীর্ণ-দেহের বাসায় ফিরে আসতে হয়; এই নশ্বর জগতে এই ভঙ্গুর দেহ আশ্রয় কোরে আমার মুক্তিকামী আত্মা আর থাকতে চাইছে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই—আমার এত আধ্যাত্মিক শিক্ষা সত্ত্বেও আমার ভিতরকার বস্তু-তান্ত্রিকের ক্ষুধা তখনো মেটেনি। এখানে আসবার কিছুদিন পরেই আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। তার কমনীয় রূপ, সুন্দর দেহ এবং উচ্চ-শিক্ষা আমায় যত না মুগ্ধ করুক, তার সতেজ দৃপ্ত প্রকৃতি আমায় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তার খুড়োর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, রেল-গাড়ীতে—যখন কাশী থেকে আসছিলাম—সেই সময়। এই সকল যোগ-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং দুর্নিবার কৌতূহল লক্ষ্য কোরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি।

মেয়েটিকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প করলাম। বিবাহের পর তাকে আমার শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে দুজনে পরমানন্দ উপভোগ করব—এই আকাঙ্ক্ষা দিন দিন মনের মধ্যে প্রবল হোয়ে উঠতে

লাগল। শেষে একদিন তার কাছে মনের কথা খুলে বলে প্রস্তাব জানালাম। কিন্তু মেয়েটি ইতিমধ্যে অন্য একটি যুবককে তার ভালবাসা অর্পণ করেছিল; সেজন্য সে আমার নিবেদন অগ্রাহ্য করলে। অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক চেষ্টার পর আমি তাকে পাবার সব আশা পরিত্যাগ কোরে এখন কেবল আমার এই নশ্বর দেহ ছেড়ে যাবার আশায় অপেক্ষা কোরে বসে' আছি।

যদিও এখন আমার বয়স পঞ্চাশ পার হোয়ে গেছে, তবুও মনে হয়, এখনো আমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকব। আত্মহত্যা করতে পারি না, কারণ তা মহাপাপ এবং পরলোকে আত্মঘাতীর শাস্তি বড় ভয়ানক। কিন্তু জড়-জগতে আর এক দণ্ডও থাকবার ইচ্ছে আমার নেই; তাই, কি উপায়ে এখানকার অস্তিত্ব পরিত্যাগ করতে পারি,—বহুদিন ধরে' এ-বিষয়ে চিন্তা করতে করতে এই সত্য আবিষ্কার করেছি যে, যদি কোন আত্মা স্বেচ্ছায় আমার দেহে বাস কোরে এর ধার্য্য জীবনটুকু যাপন করতে সম্মত হয় তাহলেই আমার আত্মা চিরদিনের মতো এ জগৎ ছেড়ে যেতে পারে।

কিন্তু সমস্যার এ সমাধান নিজের কাছেই বড় অসম্ভব মনে হল; কোথায় এমন লোক পাব, যে তার নিজের জীবন ছেড়ে এই জরা-জীর্ণ দেহ আশ্রয় কোরে ডাক্তার অগ্নিবাহন রুদ্র ব'লে জীবন-যাপন করতে রাজী হবে?

যাহোক, ভাবলাম, হয়ত নিয়তি কোনদিন এই রকম একজন লোক আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে; এবং সেই উদ্দেশ্যে বাড়ির দরজা আমার সদা-সর্ব্বদাই খোলা থাকত। যদি কোন

চোর বা বদমাইস লোক এসে ঢুকত তাহলে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে আমার কথায় রাজী করাবার চেষ্টা করতাম।

আজ তুমি এসেছ; তুমি একজনকে খুন কোরে আসছ ; যদি ধরা পড়—প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য। অপর-পক্ষে, যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হও তাহলে তোমার আত্মাকে আমার দেহে চালনা কোরে দিয়ে আমি চিরদিনের মতো এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করি, আর তুমিও আইনের হাত থেকে এবং মরণের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অগ্নিবাহন রূপে পরম নিরাপদে জীবন কাটিয়ে দিতে পার। সুতরাং কি চাও? মৃত্যু; না, ডাক্তার অগ্নিবাহন রুদ্রের জীবন?

চান্স

অরবিন্দ গভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া এই বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছিল ; প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটাকে তাহার পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে হইল—অগ্নিবাহনের প্রস্তাবের উপর আস্থা স্থাপন করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় অরবিন্দ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সুরু করিল ; বলিল—যদি আপনার প্রস্তাবে রাজী হই এবং আমার আত্মাকে আপনার দেহে চালনা করতে অনুমতি দিই, আমার দেহের কি পরিণতি হবে ?

ডাক্তার অগ্নিবাহন বলিলেন—বাহ্যতঃ, সেটা মৃতদেহের মত পড়ে থাক্‌বে—যতদিন না আবার তোমার আত্মা তার মধ্যে ফিরে এসে তাকে জীবন্ত কোরে তোলে !

—তা হলে আমি আবার নিজের দেহে ফিরে আস্‌তে পারবো ?

—নিশ্চয় পারবে। আমার দেহটার বয়স পঞ্চাশ ; তোমার প্রায় পঁচিশ। এর-থেকে মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে বেশী দিন

এ পৃথিবীতে থাক্‌বে। সুতরাং, তোমার আত্মা ততদিনই আমার দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বে যতদিন আমার এই দেহটার বেঁচে থাকবার মেয়াদ আছে। তারপর, যখন আমার পরমায়ুর অবসান হবে তখন তোমার আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে আবার তোমার নিজের দেহে ফিরে যাবে।

—কিন্তু ততদিনে আমার প্রাণহীন দেহটা কি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না?

—না। তার কারণ, সেটা তো মৃত নয়; শুধু অচেতন, ঘুমন্ত। অবশ্য আমার দেহের মধ্যে থাকবার সময়ের ভিতর যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তোমার আত্মা আমার দেহের মধ্যে কাজ করবে বটে কিন্তু তোমার দেহ নষ্ট হোয়ে যাবে।

—যতদিন আমি আপনার দেহের মধ্যে অবস্থান করব ততদিন আমার দেহটা থাকবে কোথায়?

—এই বাড়িতেই থাক্‌বে; বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যখন আমার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যেত, তখন পাছে কেউ সেই নিস্পন্দ দেহটা দেখে আমাকে মৃত মনে কোরে দেহের কোন কিছু অনিষ্ট করে সেইজন্যে গোপনে আমি একটা ঘর তৈরী করেছি; সেইখানে আমার দেহকে নিরাপদে রেখে সবার অলক্ষ্যে আমি সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করি।

অরবিন্দ বলিল—কোথায় সে গুপ্ত-গৃহ, আমি কি দেখতে পারি?

"নিশ্চয় পার" বলিয়া ঘরের এক কোণে অবস্থিত একটা

কাঠের আলমারির নিকটে গিয়া তিনি বলিলেন—সে ঘর তোমার জেনে রাখা বিশেষ দরকার, কারণ সেইখানেই তোমার দেহ নিরাপদে থাক্‌বে। দেখ—

অগ্নিবাহন আলমারির পিছনে হাত চালাইয়া দিয়া একটি বোতাম টিপিতেই আলমারিটা পিছনের দেওয়াল সমেত ধীরে ধীরে এক পাশ হইতে আর এক পাশে খানিকদূর সরিয়া গেল। এবং সেই ফাঁকের ভিতর অন্ধকার পাতালপুরীতে নামিবার জন্য কতকগুলা সোপানশ্রেণী দেখা গেল।

ক্ষিপ্র-হস্তে আলমারির মাথার উপর হইতে বাতি-দানটা লইয়া বাতি জ্বালাইয়া অগ্নিবাহন সেই অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইলেন ; অরবিন্দ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল।

দুই এক ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই, ডাক্তার পাশের দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়া একটি স্প্রিং টিপিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল শুদ্ধ আলমারিটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল ; বলিলেন—দেখ্‌ছ! বাইরের লোক কিছুতেই জান্‌তে পারবে না, আমরা কোথায় লুকিয়েছি। নেমে এস।

বিমূঢ় অরবিন্দ বাতির আলোর সাহায্যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়া একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল। ডাক্তার সরিয়া গিয়া দেওয়ালের এক কোণে হাত দিয়া একটা বোতাম টিপিলেন,—দেখিতে দেখিতে সম্মুখের দেওয়াল ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়া গেল।

অরবিন্দের হাতের উপর একটা ঝাঁকানি দিয়া ডাক্তার

বলিলেন—প্রথম ঘরটা করা হয়েছে সাবধানতা অবলম্বন করবার জন্যে ; যদিই বা কেউ প্রথম রহস্যটা জান্‌তে পারে, দ্বিতীয় ঘরটার সন্ধান কিছুতেই পাবে না।

এই বলিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া সুইচ টিপিতেই তীব্র আলোয় ঘর ভরিয়া গেল ; অরবিন্দের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ছোট্ট গোলাকার ঘরটী ; দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র ছবি এবং অদ্ভুত মূর্ত্তি আঁকা ; মেঝেয় পুরু রঙীন কার্পেট ; এক ধারে একটা বাঘ-ছাল-আঁটা কৌচ, পাশে একটা ছোট্ট তেপায়া রহিয়াছে। ডাক্তার একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—এ ঘরটীর কথা মাত্র দুজনে জান্‌লাম। যতদিন তুমি আমার দেহ আশ্রয় কোরে থাকবে ততদিন তোমার দেহ এই ঘরে নিরাপদে লুকনো থাক্‌বে। তারপর অবশ্য আবার তুমি নিজের দেহে ফিরে যাবে।

অরবিন্দ চিন্তিত-স্বরে বলিল—ধরুন যদি খুব শীঘ্র আপনার দেহের মৃত্যু ঘটে এবং আমাকে নিজের দেহে ফিরে আসতে হয়, তাহলে তো পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করবে ?

ডাক্তার কহিলেন—সে তোমার বরাত ! তোমাকে লুকোবার একটা আশ্রয় দিচ্ছি ; তারপর যদি কালই আমার মৃত্যু ঘটে—তার আমি কি করব—তোমার দুর্ভাগ্য ! কিন্তু আমার মনে হয়, যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে কিম্বা আমার দেহ ধারণ কোরে থাক্‌বার সময় তুমি আত্মহত্যা না কর, তাহলে আমার দেহ এখনো অনেক

দিন এ পৃথিবীতে থাক্‌বে এবং ততদিনে তোমার অপরাধের কথা লোকে প্রায় ভুলেই যাবে। তুমি তখন অন্য দেশে গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে। যাক্, সব কথাই তোমাকে খুলে বল্লাম—এখন যদি তুমি রাজী হও তাহলে এই কৌচের ওপর শুয়ে পড়, আমি তোমাকে রূপান্তরিত করি।

অরবিন্দ বিহ্বল-চিত্তে কৌচের উপর বসিয়া বলিল—আপনার নাম-সই এবং হাতের লেখার অনুকরণ কি কোরে করতে পারব?

ডাক্তার একটা ছোট্ট ধুনুচিতে কাঠের আগুন জ্বালাইতে জ্বালাইতে বলিলেন—ওগুলো আপনা-থেকেই পারবে। হাতের লেখা দেহের কাজ; আত্মার নয়। আমার দেহ যা কাজ করতে সক্ষম, সে সব কাজ তুমিও করতে পারবে। আমার আত্মার ক্ষমতা তুমি পাবে না একটুও। আমার শিক্ষা-দীক্ষা আমি তোমায় অর্পণ করতে পারবো না, কারণ তাদের আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ; কিন্তু আমার সমস্ত বস্তু-জ্ঞান বা দৈহিক ক্ষমতা, এতদিনে যা অর্জ্জন করেছি, সে সমস্তই তুমি পাবে এবং নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে।—তুমি প্রস্তুত?

অরবিন্দ কৌচের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল—প্রস্তুত। কিন্তু আমি মীরা মিত্র বলে একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ পণে আবদ্ধ; তার কি হবে?

ডাক্তার সেই ধূমায়িত আগুনের উপর হাওয়া করিতেছিলেন; অরবিন্দের কথায় তাঁহার মুখ একটা অদ্ভুত বিকৃত হাসিতে ভরিয়া গেল; মুখ তুলিয়া বলিলেন—সে তোমাকে তো আর চিনতে পারবে

না! কিন্তু তোমাকে নিরাপদ করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে—প্রেমের কথা এখন ভুলে যাও।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অরবিন্দ ডাক্তারের কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিল। আগুন ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠিতেই তিনি ধুনুচিটার চারিদিকে কিসের শ্বেত-চূর্ণ দিয়া একটা গণ্ডী টানিয়া দিলেন; পরে নীচু হইয়া সেই সাদা পদার্থের উপর আঙ্গুল দিয়া নিম্নস্বরে অরবিন্দের অবোধ্য ভাষায় কি বলিতেই দপ করিয়া একটা নীলাভ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া সেই গণ্ডীর উপর গোল আকার ধারণ করিয়া শিখা বিস্তার করিল। ডাক্তার তখন একটা ছোট রূপার কৌটা হইতে কতকগুলা শিকড় বাহির করিয়া সেই আগুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং দুহাত এক করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করতে লাগিলেন।

একটা ঘন ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরিয়া গেল। তাহার উগ্র গন্ধে অরবিন্দের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অগ্নিবাহন অরবিন্দের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি শীঘ্রই আমার দেহ ছেড়ে চলে যাব এবং তোমার আত্মাকে আমার দেহের ভার দিয়ে যাব। তুমি কি এই ভার নিতে প্রস্তুত আছ?

ধীরে ধীরে অরবিন্দ বলিল—আছি!

তখন তাহার চেতনা লুপ্তপ্রায়······

ডাক্তার আগুনের কাছে গিয়া বলিলেন—তাহলে তোমার চোখ বোজ। বিদায় অরবিন্দ—আমার দেহের মধ্যে থেকে প্রার্থনায় অনুতাপে তোমার পাপ বিদ্ধ আত্মা শান্তি লাভ করুক···

ডাক্তারের আদেশ অনুসারে অরবিন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিল; ঘন-বাষ্পের ভারে তাহার মস্তিষ্ক যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার মন্ত্র পাঠ করিয়া চলিয়াছেন—কী অমানুষিক গম্ভীর কণ্ঠ! চারিদিকে তাঁহার কি রহস্যময় অপার্থিব স্তব্ধতা!! অরবিন্দের কানে অগ্নি-বাহনের সেই অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণের স্বর ক্রমশঃ যেন দূর হইতে বহু-দূরে সরিয়া যাইতেছে······

সহসা একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্যথায় তাহার সমস্ত দেহ মুচড়াইয়া উঠিল; ভীত হইয়া অরবিন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর ফুটিল না···তাহার বোধ হইল যেন তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়া আগুনের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে···যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সহসা অরবিন্দের মনে হইল, চোখের সম্মুখে একটা কালো পর্দ্দা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে···মুহূর্ত্ত পরেই সে অচেতন হইয়া পড়িল ··· ···

চোখ মেলিয়া অরবিন্দ দেখিল—মাটীর উপর নির্ব্বাপিত-প্রায় আগুনের পাশে সে শুইয়া আছে। মুখের উপর কিসের স্পর্শ অনুভব করিয়া সে উঠিয়া বসিল ; সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের কোচে শায়িত দেহের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়া নিজের অঙ্গে পড়িতেই সভয়ে সবিস্ময়ে অরবিন্দ দেখিল—তাহার পরণে ডাক্তারের লম্বা কোট, পায়ে তাহারই জীর্ণ জুতা পরা রহিয়াছে ; মুখে এক মুখ দাড়ি। বিকৃতকণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া অরবিন্দ দেওয়ালে টাঙান আর্শির সম্মুখে গিয়া নিজের পরিবর্ত্তিত দেহের আকৃতি দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সুন্দর সুপুরুষ অরবিন্দ রায়ের পরিবর্ত্তে সে এখন জরা-জীর্ণ ডাক্তার অগ্নিবাহন রুদ্র—রূপান্তর সঙ্ঘটিত হইয়া গেছে···

কোচে শায়িত নিজের প্রাণহীন দেহটার প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া অরবিন্দ মন্ত্র চালিতের ন্যায় উপরে উঠিয়া আসিল। বাতি নিবাইয়া গুপ্ত দ্বার বন্ধ করিয়া চেয়ারের উপর আসিয়া বসিল।—যাই হোক, অগ্নিবাহনের দেহের আশ্রয় লাভ করিয়া সমূহ বিপদ হইতে সে পরিত্রাণ পাইয়াছে ; নিজের গুরুতর অপরাধের জন্য ধরা পড়িয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আশঙ্কা হইতে সে এখন মুক্ত। নিজেকে নিরাপদ কল্পনা করিয়া অরবিন্দ অনেক সুস্থ বোধ করিল।

এবং তারপর উত্তেজনার শ্রান্তি বশতঃ কেদারার এক ধারে মাথা হেলাইয়া দিয়া অবিলম্বে সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পাঁচ

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিতেই একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া অরবিন্দ উঠিয়া বসিল ;—গত রাত্রের ঘটনাগুলো তাহার কাছে ভীষণ দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত ঘরের সাজ সজ্জা এবং নিজের অদ্ভুত বেশ ও আকৃতি তাহাকে তীক্ষ্ণ ব্যথার সহিত স্মরণ করাইয়া দিল—তাহার বর্ত্তমান অবস্থা স্বপ্ন নয় ; অত্যন্ত কঠোর সত্য !

বিষাদাচ্ছন্ন অন্তরে অগ্নিবাহন রুদ্র হাত মুখ ধুইয়া টেবিলের ধারে আসিয়া বসিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনার বশে সে একি করিয়া ফেলিল ! নিজের যৌবন-দৃপ্ত আত্মাকে সে একটি অপরিচিত কুৎসিৎ দেহের মধ্যে চিরদিনের মতো আবদ্ধ করিল !! কতদিন ধরিয়া তাহার এ সুদুঃসহ কারাবাস চলিবে তাহা কে বলিতে পারে ?

পরক্ষণেই নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা মনে পড়িল।—সে একজনকে হত্যা করিয়াছে ; সে অপরাধের চরম দণ্ড কি, তাহা সে

ভালই জানে! সে দণ্ড মাথা পাতিয়া লওয়া অপেক্ষা কি এই পরিবর্ত্তিত জীবন শ্রেয় নয়? শতবার! অরবিন্দ মনে মনে বলিল, ইহা ভালই হইয়াছে যে আইনের কবল হইতে মুক্তির এই অদ্ভুত পথ সে আজ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে পঞ্চানন আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

এই সেই চতুর সরকার, যাহার কথা ডাক্তার উল্লেখ করিয়াছিল;—তাহার চেহারা দেখিয়াই অরবিন্দের মন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল; খর্ব্বাকৃতি শীর্ণ পঞ্চাননের একটা চোখে ছানি পড়া, কাহারও সহিত কথা বলিবার সময় সে সেই চোখটি বুজিয়া থাকে। তখনকার তাহার একটি চোখের সেই তীক্ষ্ণ ক্রূর চাহনি লোকের মনে তাহার প্রতি বিশেষ স্নিগ্ধভাব জাগাইয়া তোলে না।

ঘরে ঢুকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া পঞ্চানন বলিল—সকালে কি রান্না হবে?

ডাক্তারের অন্য আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না; পঞ্চাননকে তাঁহার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও তদারক করিতে হইত।

ডাক্তার সচরাচর কি আহার করে তাহা অরবিন্দ জানিত না; বলিল—যেমন রোজ হয় তেমনি হোক।

—আপনি কি সকালে কোথাও বেরোবেন ?

—না। আমার শরীরটা ভাল নেই। হ্যাঁ, আমার কোন চিঠিপত্র আছে ?

পঞ্চানন কহিল—আজ্ঞে না ; থাকলে তো দিয়েই যেতাম। আপনি কি কাল শুতে যান নি ? শরীর খারাপ বলছিলেন, কোন ডাক্তার—

অরবিন্দ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—না, ডাক্তার ডাক্তে হবে না—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি। কাল শুতে যাবার সময় পাই নি ; অনেকগুলো চিঠি লেখবার দরকার ছিল।

পঞ্চানন ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে টেবিলের উপরকার অব্যবহৃত লেখার সরঞ্জামগুলার প্রতি চক্ষু বুলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—স্নানটা আজকে সকাল সকাল কোরে নেব; স্নান হোয়ে যাবার পরেই আমার ভাত দিতে বলো।

পঞ্চানন "য্যাজ্ঞে" বলিয়া মাথা নাড়িল। অরবিন্দ স্নানের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

অরবিন্দ ভিতরের দিকে অদৃশ্য হইতেই, পঞ্চানন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিল ; হেঁট হইয়া টেবিলের উপরকার কাগজপত্র দেখিল ; তারপর ঘরের মধ্যস্থানে দুখানা কেদারা সামনা-সাম্‌নি বসানো রহিয়াছে দেখিয়া তাহার এক চক্ষু

উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; পরক্ষণেই ঘরের মেঝের উপর একটা নূতন লাঠি দেখিয়া ক্ষিপ্র গতিতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল—

নিশ্চয় কেহ কাল রাত্রে ডাক্তারের কাছে আসিয়াছিল ; এ লাঠি তাহারই। ইংরেজী অক্ষরে "এ, আর," নাম সোনার-পাতের উপর খোদাই করা। কাহার নাম ? পঞ্চানন মনে মনে ভাবিতে লাগিল। অগ্নিবাহন রুদ্র ? উঁ হুঁ ! কৃপণের শিরোমণি তাহার মনিব সোনা-বাঁধানো লাঠি কিনিবে না—তাহা সে স্থির জানিত।

ডাক্তারের অসাধারণ এবং রহস্যময় জীবন-যাত্রার প্রণালী পঞ্চাননের মনে বহুদিন হইতেই গভীর সন্দেহের সঞ্চার করিয়াছিল। কালও পর্য্যন্ত সে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহজনক প্রমাণ পায় নাই ; কিন্তু এই লাঠি দেখিয়া আজ তাহার বিশ্বাস দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কাল রাত্রে তাহার মনিবের ঘরে বাহিরের কোন লোক আসিয়াছিল—ইহা সে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া লাঠিটা লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া অরবিন্দ খাইয়া লইল। খাওয়ার পর যখন সে পুনরায় বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিল তখন তাহার বিক্ষিপ্ত মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। টেবিলে বসিয়া একটী সিগারেট

ধরাইয়াছে, এমন সময় তাহার লাঠিটার কথা মনে পড়িল। সহসা একটা নূতন লাঠি দেখিয়া পঞ্চাননের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইতে পারে—এই ভাবিয়া অরবিন্দ লাঠিটাকে গুপ্ত গৃহেই রাখিয়া দিবে স্থির করিল; পঞ্চাননকে সে ইতিমধ্যেই চিনিয়া লইয়াছিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লাঠিটা দেখিতে না পাইয়া অরবিন্দ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল; কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না। হয়ত ভুলক্রমে সে উহা গুপ্ত-কক্ষে রাখিয়া আসিয়াছে—ইহা মনে করিয়া সে তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া গুপ্ত-গৃহে নামিয়া গেল। কিন্তু, বলা বাহুল্য, সেখানেও লাঠিটা খুঁজিয়া পাইল না।

উপরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বসিয়াছে এমন সময়ে পঞ্চানন আসিয়া সেদিনকার দৈনিক খবরের কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিল। অরবিন্দ কাগজখানা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ, ভাল কথা পঞ্চানন, একটা মোটা বেতের ছড়ি দেখেছ—সোনা বাঁধানো। এই ঘরেই ছিল।

পঞ্চানন অম্লান বদনে বলিল—আজ্ঞে না! সেটা কি আপনার?

—না; হ্যাঁ, না আমারই; কাল বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলাম; এই ঘরেই ছিল।

—কাল আপনি বেরিয়েছিলেন! তা তো জানতাম না!

অরবিন্দ খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধরিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে

বলিল—তুমি অনেক কিছুই জান না! আচ্ছা, এখন যেতে পার।

পঞ্চানন প্রস্থান করিবার পর অরবিন্দ মনস্থির করিয়া কাগজ পড়িতে লাগিল; কালকের ঘটনার কোন উল্লেখ আছে কি না, পাতা উল্‌টাইয়া তাহা দেখিতে লাগিল—

খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার চোখে পড়িল—

"অদ্ভুত ঘটনা! অদ্ভুত ঘটনা!!"

রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অরবিন্দ পাঠ করিতে লাগিল—"অরবিন্দ রায় নামক একজন বিলাত-ফেরৎ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার কোন পরিচিত লোক কাল রাত্রে তাঁহার হোটেলে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অরবিন্দ বাবুকে দেখিতে পান না বটে কিন্তু তাঁহারই ঘরে রক্তাক্ত-দেহে একটি লোককে অৰ্দ্ধমৃত অবস্থায় শায়িত দেখেন।

"আহত লোকটির নাম—জ্যোতিষ সেন; ইনি অরবিন্দ রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু! শুশ্রূষার ফলে জ্যোতিষ বাবু কতক পরিমানে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তিনি কোন কথাই প্রকাশ করিতেছেন না।

"এদিকে উক্ত ঘটনার পর হইতে অরবিন্দ রায়কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; তিনি নিরুদ্দেশ!!

"আমাদের মনে হয়—ইহার ভিতর কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে—"

পড়া শেষ করিয়া অরবিন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল, —যাক্, তাহা হইলে সে জ্যোতিষকে হত্যা করে নাই ; আর তাহাকে পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে না ! আঃ, কি তৃপ্তি !—

পরক্ষণেই নিজের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার মন হইতে সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে মুছিয়া গেল। অরবিন্দ রায় বলিয়া সে নিজেকে আর জগতের কাছে পরিচয় দিতে পারিবে না ; পৃথিবীর বুক হইতে অরবিন্দ রায়ের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য হয়ত মুছিয়া গিয়াছে ! বন্ধুদের কাছে, সমাজের কাছে, মীরার কাছে সে আজ লুপ্ত ; অনাগত ভবিষ্যতে কোনদিন নিজের সত্যকার পরিচয় লইয়া সে কী আর তাহাদের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিবে ?

ছয়

দিন যায়। ক্ষুব্ধ বিষণ্ণচিত্তে অরবিন্দ, অগ্নিবাহনরূপে তাহার নিরানন্দ জীবন যাপন করিয়া চলে। তাহার মনের সকল আশা-আনন্দ মুছিয়া গিয়া একটা গভীর হতাশ্বাস পাষাণ-ভারের মতো তাহার অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছে। মনের মধ্যে একটা সদা-সশঙ্কিতভাব সর্ব্বসময়েই বিরাজ করে। তাহার উপর আজ-কাল ধূর্ত্ত পঞ্চানন তাহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহা তাহার কথাবার্ত্তা এবং আচরণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কেন যে সে তাহাকে সন্দেহ করে, অরবিন্দ কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারে না; নিজের মনে অহর্নিশি একটা অশান্তি অনুভব করে।

দিন কয়েক পরে সেদিন সকালে অরবিন্দ অভ্যাসমত খবরের

কাগজ পড়িতে পড়িতে সহসা এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল—

"অরবিন্দ রায়ের সম্বন্ধে যিনি সঠিক কোন খবর দিতে পারিবেন তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হইবে···।"

অরবিন্দ বিজ্ঞাপন পড়িয়া প্রথমে ভাবিল—পুলিস তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কিন্তু তৎপরেই তলায় নাম-ঠিকানা দেখিয়া সে পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঠিকানার স্থানে ছিল—এম্, এম্ ; বাণীকুঞ্জ, বালিগঞ্জ।

মীরা তাহার খবর পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে সহস্র দুঃখের মাঝেও এই অনুভূতিটুকু অরবিন্দকে যেন আনন্দের সপ্তম-স্বর্গে লইয়া গেল।

সহসা তাহার মনে পড়িল—অগ্নিবাহন বলিয়াছিল যে একজন তরুণীর ভালবাসা না পাইয়া তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেছে। কে সে তরুণী ? যদি তাহার নাম পাওয়া যায় তাহা হইলে অরবিন্দ তাহার সহিত পুনরায় দেখা করিবে ; কি ফল হয়, তাহা কে বলিতে পারে ? সে সাক্ষাতের ফলে হয়ত তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের ধারা অন্য কোন নূতন পথে প্রবাহিত হইবে ! বৈচিত্র্যের আশায় অরবিন্দের নিশ্চল অন্তর উন্মুখর হইয়া উঠিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে অগ্নিবাহনের ডায়েরী বাহির করিল। ডাক্তার বলিয়াছিল—সেই ডায়েরীর মধ্যেই তাহার জীবনের সকল কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। কৌতূহলীচিত্তে অরবিন্দ পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতে লাগিল···

হঠাৎ এক স্থানে আসিয়া সে চমকিয়া উঠিল; সেই পৃষ্ঠার খানিকটা অংশ পাঠ করিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; হাত হইতে খাতা মাটীতে গড়াইয়া পড়িল—

মীরা মিত্রের প্রতি ভালবাসা নিবেদনে ডায়েরীর প্রতিটী ছত্র পূর্ণ, আকুল এবং অধীর হইয়া রহিয়াছে !!

আকম্পিত অন্তরে অরবিন্দ খাতা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। মীরার কাকার এই সকল গুপ্ত-বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেই সূত্রে ট্রেনে তাঁহার সহিত অগ্নিবাহনের আলাপ হয়। পরে তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে গিয়া মীরাকে দেখিয়া ডাক্তার মুগ্ধ হয়।

কি আশ্চর্য্য ঘটনা-চক্র !

খাতার একস্থানে রহিয়াছে—

"···মীরা সুন্দর ! ওর ওই লাবণ্যের অন্তরালে ওর নিস্কলুষ আত্মা বুঝি আরও সুন্দর ! ওর ভিতর আমি একটা সতেজ শ্রী এবং চিত্তের দৃঢ়তা লক্ষ্য কোরে মুগ্ধ হোয়ে গেছি। জীবন-সঙ্গিনীরূপে

যদি ওকে পাই তাহলে আমার সমস্ত শিক্ষা ওকে প্রদান করব। আজ গিয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করব—"

"......সব বৃথা—ও আমায় প্রত্যাখ্যান করল ; ও আর এক-জনকে ভালবাসে। অরবিন্দ রায় অপদার্থ বিলাসী যুবক,—তাকেই ভালবেসে ও আমার জীবনকে ব্যর্থ কোরে দিল—"

সুদীর্ঘ ডায়েরী। পাতায় পাতায় উচ্ছাসে ভরা! অরবিন্দ উদ্বেল-চিত্তে ডায়েরী শেষ করিল।

অগ্নিবাহন মীরাকে ভালবাসিত। কিন্তু ডাক্তারের লেখা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় মীরা অরবিন্দকেই ভালবাসে। তবুও অরবিন্দ মনে মনে কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। হয়ত মীরার হৃদয়ে এই ডাক্তারের জন্যও অল্প একটু স্থান ছিল এবং হয়ত এখনো আছে। হয়ত —।

ঈর্ষ্যার উত্তাপে তাহার মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

বেহারাকে ডাকিয়া অরবিন্দ একখানা ট্যাক্সি আনিতে বলিল, —সে এখুনি বালিগঞ্জে কেদার বাবুর বাড়ি যাইবে এবং মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রতি মীরার মনোভাব লক্ষ্য করিবে।

ট্যাক্সি আসিল। পঞ্চাননকে গেটের সম্মুখে দেখিয়া "আমি একটু ঘুরে আসছি" বলিয়া, অরবিন্দ ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। পঞ্চানন ক্ষিপ্র পদে গাড়ির পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেই শুনিতে পাইল—"বালীগঞ্জ চলো।"

পঞ্চানন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া, ডাক্তারের ঘরে ঢুকিয়া কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল। খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সহসা গৃহকোটর-অভ্যস্ত কৃপণ ডাক্তার ট্যাক্সি লইয়া বালীগঞ্জ অভিমুখে রওনা হইল কেন—তাহা পঞ্চানন কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সহসা তাহার দৃষ্টি টেবিলের উপর প্রসারিত খবরের কাগজখানার উপর পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের পৃষ্ঠার উপর চোখ বুলাইতেই সে অরবিন্দ রায়ের সম্বন্ধে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাইল এবং এক নিঃশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া ফেলিল;—হ্যাঁ, হ্যাঁ; যা ভেবেছি তাই। এই যে নিরুদ্দিষ্ট অরবিন্দ রায়, এরই লাঠি সেদিন রাত্রে পেয়েছি! 'এ, আর' খোদাই করা নাম এরই। নিশ্চয় সেদিন রাত্রে অরবিন্দ বোলে কোন লোক ডাক্তারের ঘরে এসেছিল। নীচে ঠিকানা দেখছি —বালীগঞ্জ; ডাক্তারও বালীগঞ্জ ছুটলো। তাই তো। ব্যাপার যে ক্রমেই ঘোরালো হোয়ে উঠ্‌লো—

এই বলিয়া পঞ্চানন খবরের কাগজ হইতে বিজ্ঞাপনটি টুকিয়া লইল।

সাত

বালিগঞ্জের "বাণীকুঞ্জে" আগমন করে না এমন ভদ্রলোক বিরল। সাহিত্যিক, রাজ-নীতিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশ-সেবক—এমনিতর ছোটবড় বহুবিধ গণ্যমান্য লোক "বাণীকুঞ্জের" মালিক কেদার মিত্র মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসেন। কেদার বাবুও সকলকে সমান সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাহাদের চাঁদার খাতার পৃষ্ঠায় একটা মোটা ডোনেশনের টাকা লিখিয়া দিতেও যেমন তাঁহার মন কোন দিনই বিরূপ হয় না, তেমনি তাহাদের সহিত বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করিতেও কোনদিন তিনি বিরক্তি বোধ করেন না।

কেদার বাবু লোকটি ছিলেন অত্যন্ত ঢিলা প্রকৃতির; সরল এবং অমায়িক। নিজের পুত্রকন্যা ছিল না। বহুদিন হইল মৃতদার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একমাত্র কন্যা মীরাকে লইয়াই তাহার সংসার। মীরা কিসে সুখে থাকে; মীরা কিসে সুশিক্ষিতা হয়—ইহাই ছিল তাঁহার উদ্বেগ-লেশ-হীন জীবনের একমাত্র চিন্তা।

নিজের তাঁহার খরচ-পত্তর বিশেষ কিছুই ছিল না; শুধু

নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করার অভ্যাসটা তাঁহার বাতিকের মতো দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই সকল পুস্তক এবং বয়স্ক ও তরুণ বন্ধু-বান্ধবদের লইয়াই তাঁহার নিরুদ্বিগ্ন দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া কাটিয়া যাইত।

সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, এবং সে-বিষয়ে অধিকাংশ আলোচনা চলিত, "নব-বাণী" পত্রিকার সম্পাদক, তরুণ সাহিত্যিক প্রকাশ গুপ্তর সহিত।

সেদিন বাঙলা-সাহিত্যের আধুনিকতা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

কেদার বাবু বলিলেন—দেখুন প্রকাশ বাবু, আজকালকার তরুণ লেখকদের এই একটানা প্রেমের কতকগুলো বাঁধা বুলি—ও গুলো নেহাৎ মনোটোনাস্ হোয়ে দাঁড়িয়েছে; সবাইকার সেই এক রুগ্ন-অভিব্যক্তি আর 'সিক্লি সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্।'

প্রকাশ আপত্তি করিয়া বলিল—কিন্তু আপনি হয়ত সব মাসিক-সাহিত্য পড়েন না; আজকাল জীবনের নানা বিভিন্ন দিক নিয়ে কাব্য সৃষ্টি হচ্ছে।

এই বলিয়া তাহার উদাহরণ স্বরূপ সে কোন আধুনিক কবির একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মীরা এতক্ষণ সেইখানে বসিয়াছিল, সহসা উঠিয়া বাড়ির ভিতর

চলিয়া গেল। কেদার বাবু বহুক্ষণ হইতেই তাহার বিমনা ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন এক্ষণে তাহাকে সে-স্থান হইতে বিরক্তিভরে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তিনিও তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রকাশ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

মীরা উঠিয়া গিয়া একটা পাথর বাঁধান বেদীর উপর বসিয়াছিল। কেদার বাবু তাহার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—সারাদিন ধ'রে সমস্তক্ষণ এমনি-কোরে ভেবে-ভেবে শরীর নষ্ট কোরে তো কোন ফল হবে না মা।

পিতৃব্যের মুখে স্নেহের বাণী শুনিয়া মীরা উদ্‌গত-অশ্রু দমন করিয়া বলিল—কিন্তু এখনো তো কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না কাকাবাবু; কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম কিন্তু কোনো ফল হল না।

—হয় ত সে তোমার বিজ্ঞাপন দেখতে পায় নি, পেলে নিশ্চয় এতদিনে আসত; কিম্বা খবর দিত।

মীরা কহিল—আপনারা তো এত গুপ্ত-বিদ্যা, এত যোগবলের চর্চ্চা করেন; বলতে পারেন না—অরবিন্দ বাবু এখন কোথায়?

—আমি পারি না মা। কিন্তু অগ্নিবাহন চেষ্টা করলে বোধ হয় পারে; লোকটার এ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য।

এই সকল যোগ-বল, ভবিষ্যৎ-গণনা প্রভৃতি বিষয় লইয়া অগ্নিবাহনের সহিত তাহার খুড়ামহাশয়ের গভীর আলোচনা হইত—তাহা মীরা জানিত। কিন্তু সে ও-সকল কিছুই বিশ্বাস করিত না, এবং অগ্নিবাহনের প্রতি তাহার চিত্ত বরাবরই বিমুখ ছিল। তাই শ্লেষভরে কহিল—পাণ্ডিত্য না ছাই! ভণ্ড কোথাকার!

—না মা ভণ্ড নয় ; এ সব বিষয়ে তার অসাধারণ জ্ঞানের চাক্ষুস পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি। জানই ত পৃথিবীতে এমন সব ব্যাপার ঘটে যা মানুষের কল্পনাকেও—

—ও পুরনো কথাটা আমি জানি কাকাবাবু! যাদের ওই-সব জিনিষের ওপর অন্ধ বিশ্বাস ; যারা নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় বিচার করে দেখে না—ও কথাটা তাদেরই। কিন্তু সে যাক্। যদি তিনি বল্‌তে পারেন আমার আপত্তি নেই। আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিগেস্ করব। আপনি তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দেবেন কাকাবাবু।

কেদারবাবু কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ দেখা গেল—অদূরে বেহারার সঙ্গে ডাক্তার অগ্নিবাহন তাঁহাদের দিকেই আসিতেছেন। দুই জনেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল!

কেদার বাবু বিস্মিত-কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিলেন—কি আশ্চর্য্য ডাক্তার! আপনাকেই এই মাত্র আমরা কামনা করছিলাম! আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন।

—সেটা আমার পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং—।

এই বলিয়া অগ্নিবাহন নিকটে আসিয়া মীরার দিকে ঈষৎ ঘাড় নীচু করিয়া কেদার বাবুকে বলিল—আমার নিন্দাবাদ চলছিল নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ ; মীরা বলছিল আপনি আর এ দিক মাড়ান না ; আমাদের ভুলেই গেলেন।

—না না ; তা কখনো হয়। এ-ক'দিন বাড়ি থেকে বেরুতেই

পারি নি, কতকগুলো 'এক্‌স্‌পেরিমেন্ট' করতে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম।

বাস্তবিক পক্ষে, ডাক্তার অগ্নিবাহন যে শেষ কবে কেদারবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল ; কিম্বা তাহার সহিত ডাক্তারের সখ্যতা কিরূপ—এ সকলের কিছুই অরবিন্দ জানিত না। তাহার উপর, বহুদিন পরে মীরাকে দেখিয়া অরবিন্দের অন্তর আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের সেই ভাবাবেগ অতি-কষ্টে শান্ত করিয়া অরবিন্দ মৃদুস্বরে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। কেদারবাবু কি একটা কাজে সে-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

মীরা তাহার পূর্ব্বতন প্রেম-অভিলাষী ও কর-প্রার্থীর কথাবার্ত্তা এবং আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। যে অগ্নিবাহন পূর্ব্বে গুরুজনের মত গম্ভীর হইয়া তাহার সহিত কথা কহিত—আজ তাহার মুখে একটা বিষাদের ছায়া, চোখে সদা-জাগ্রত ভয়ের চিহ্ন ; কথাগুলো আগেকার দিনের তুলনায় অন্য ধরণের,—সময়ে সময়ে খাপছাড়া।

মীরা তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল—আপনি যে আজ এসেছেন, এর জন্য বাস্তবিকই আমরা আনন্দিত। আপনার কাছ থেকে আমরা সাহায্য চাই।

—এ তো আমার পরম আনন্দের কথা! কি করতে হবে আদেশ করুন।

মীরা কহিল—অরবিন্দ বাবু এখন কোথায় বলুন? তাঁকে খুঁজে বার কোরে দিতে হবে আপনাকে!

সহসা অরবিন্দকে কে যেন মারিল! মীরা তাহাকে বলিতেছে—তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে! সে তো আর জানে না,. ইতিমধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে।

অরবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিল—অরবিন্দ বাবু? ইনিই কি এক বন্ধুকে খুন করতে উদ্যত হোয়েছিলেন?

মীরা উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিল—না, খুন করতে উদ্যত হন নি। হঠাৎ দু'বন্ধুতে ঝগড়া হওয়ায় তিনি রাগ সামলাতে না পেরে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলেন,—যাঁকে মেরেছিলেন, তিনি এখন ভাল আছেন এবং নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। সে ক্ষেত্রে অরবিন্দ বাবুর একটুও দোষ ছিল না।

মীরার কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় অরবিন্দের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল—মীরা তাহা হইলে তাহাকে এখনো সমানই ভালবাসে! কী তৃপ্তি!

বলিল—তবে তিনি এখনো ফিরে আসছেন না কেন?

মীরা কোমল কণ্ঠে বলিল—সেই জন্যেই তো ভাবনা হচ্ছে। আপনি বলুন, তিনি এখন কোথায়! কাকাবাবু বলছিলেন—এই সব দৈব-বিদ্যায় আপনার সমান কেউ নেই।

অরবিন্দ বলিল—আমি! আমি কেমন কোরে বলব?

—কেন, আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করবার যোগবল দিয়ে? হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনি বলতে পারবেন। হয়ত আপনি ইতিমধ্যেই জানেন—অরবিন্দ বাবু এখন কোথায়!

অরবিন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, আমি কেমন কোরে জানবো—

তারপর নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল—শুনুন, মিস্ মিত্র! আপনি শিক্ষিতা মেয়ে, অত উতলা হবেন না। তবে এটা ঠিক—অলৌকিক ঘটনার যুগ এখনো শেষ হোয়ে যায় নি। পৃথিবীতে এখনো অনেক বিচিত্র ঘটনাই প্রতিদিন ঘট্‌ছে! আপনার অরবিন্দ অন্ধকারে অদৃশ্য হোয়ে গেছে—কেন গেছে, কোথায় গেছে —এ সব বলা এখন অসম্ভব। তবে, তাঁকে আপনাদের কাছে ফিরিয়ে আন্‌তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

মীরা চোখ মুছিয়া বলিল—আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ—

অরবিন্দ হাসিয়া বলিল—শুষ্ক ধন্যবাদ চাই না।

মীরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তবে কি চান?

—আপনার ভালবাসা!

আর্ত্তস্বরে মীরা বলিল—না না, অগ্নিবাহন বাবু। ওটা ছাড়া অন্য কিছু চান। আপনি তো জানেন আমি অরবিন্দ বাবুকে ভালবাসি, এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না। আমার এই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কি কোন মূল্য নেই?

অরবিন্দ বলিল—বেশ, আপনার কৃতজ্ঞতাই গ্রহণ করলাম।

আজ উঠ্‌লাম। অরবিন্দের কোন সংবাদ পেলেই আপনাকে জানাবো। অস্থির হবেন না। এ সব ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করে' অপেক্ষা করা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। আপনার অরবিন্দ আপনারই আছে, এবং খুব শীঘ্রই সে আপনার কাছে ফিরে আসবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। চল্লাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন যেন খুব শীঘ্রই অরবিন্দকে খুঁজে বার করতে পারি। নমস্কার।

মীরা নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আট

দিনকয়েক পরের কথা—

সন্ধ্যা কাল। ঘরের মধ্যে অস্থির পদে অরবিন্দ পায়চারী করিতেছিল। মীরার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই তাহার মন এই জীর্ণ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের দেহের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতি মীরার অবিচলিত ভালবাসার নিদর্শন পাইয়া পরের-দেহাশ্রিত তাহার আত্মা উপায়হীন তীক্ষ্ণ ব্যথায় অনুক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

অরবিন্দ ভাবিতেছিল—কেমন করিয়া সে আবার নিজের সত্যকার জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে। কেমন করিয়া নিজের সুস্থ সুন্দর দেহ সে আবার ফিরিয়া পাইবে? কেমন করিয়া পূর্ব্বের

মতো আবার সে স্বচ্ছন্দচিত্তে বন্ধুদের মজলিসে যোগদান করিবে? কেমন করিয়া সে আবার "বাণীকুঞ্জের" সেই পরিচিত লতা-বিতানের অন্তরালে বসিয়া মীরার হাতের উপর হাত রাখিয়া নিরালা মুহূর্ত্ত উপভোগ করিবে?

অরবিন্দ ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল।

হাঁ, আছে। নিজের পূর্ব্ব জীবন ফিরিয়া পাইবার দুইটী পথ আছে—

প্রথম—কোন সাজ্ঘাতিক দুর্ঘটনার ভিতর দিয়া। দ্বিতীয়—আত্মহত্যার দ্বারা।

প্রথমোক্ত পথ অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল। দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিবার কল্পনা তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট ভীতির সঞ্চার করিল। যদিও অগ্নিবাহন বলিয়াছিল, আত্মহত্যার দ্বারা অরবিন্দ বর্ত্তমান দেহ ছাড়িয়া পুনরায় নিজের দেহে ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যদি না হয়? যদি তাহার আত্মা তাহার পূর্ব্ব আবাসে আর না ফিরিয়া যাইতে পারে? অরবিন্দ মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। এবং ভাবিয়া

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চঞ্চলচিত্তে ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল।

এদিকে পঞ্চানন তাহার নিজের ঘরে বসিয়া উত্তেজিত অন্তরে একখানি চিঠি পড়িতেছিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"যে পত্র-লেখক অরবিন্দ রায়ের সম্বন্ধে খবরাখবর দিবার জন্য মীরা মিত্রকে পত্র লিখিযাছেন তিনি যদি বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে তাহার প্রদত্ত খবর অনুযায়ী তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

আজ বৃহস্পতিবার। পঞ্চানন উৎফুল্ল-চিত্তে চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পুরস্কার লাভের আশায় তাহার মনে নানা ভাবের সৃষ্টি হইতেছিল। সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"প্রথমে মনে করেছিলাম—ডাক্তার লোকটা জালিয়াৎ আর জোচ্চর। এখন দেখছি—তিনি খুনে। মীরা মিত্রকে গিয়ে এই লাঠি দেখালেই তিনি চিন্‌তে পারবেন। তা যদি হয়—তাহলে সেদিন রাত্তিরে অরবিন্দ কর্ত্তার ঘর থেকে আর বেরোয় নি—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। নিশ্চয় ডাক্তার তাকে খুন কোরে কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে—"

সহসা অন্য-একটা চিন্তা মাথায় আসিয়া পঞ্চাননের মুখ হর্ষ-বিকশিত হইয়া উঠিল—

"মীরার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেই ডাক্তারকে চেপে ধরব

—হয় টাকা দাও, নয় পুলিস ডাকবো…মোটা টাকা চাই। দু'-তরফে কিছু আদায় কোরে নিয়ে দু'টি মাস কলকাতা ত্যাগ! মামা বলত—পঞ্চাননের মাথার বুদ্ধি একবার খুলে—ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট কোথায় লাগে। নাঃ, মামা লোকটা দেখছি সময়-সময় সত্যি কথাও বলত!

পঞ্চানন যখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন ময়দানে মনুমেন্টের তলায় তাহারই অপেক্ষায় দুইটী নর-নারী অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

মীরার বিমর্ষ মুখখানা যেন বিশেষ চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল।

প্রকাশ বলিল—আমার মনে হয় অরবিন্দ আপনার বিজ্ঞাপন দেখতে পায় নি। তা'হলে সে এতদিনে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করত। বিশেষ যখন জ্যোতিষ সেরে উঠে কাগজের মারফতে নিজের দোষ স্বীকার করেছে তখন তো তার এ রকম অজ্ঞাতবাসের কোন প্রয়োজনই নেই।

পাংশু মুখে মীরা বলিল—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি প্রকাশবাবু। সমস্তই চুকে গেল, জ্যোতিষবাবু সেরে উঠে তাঁর দোষ স্বীকার কোরে তাঁকে ফিরে আসবার জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন,

আমিও ক'দিন ধ'রে সব-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—কিন্তু তাঁর কোন সংবাদই নেই। সেই জন্যই আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে মনে হচ্ছে, হয়ত তিনি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন; হয় ত তাঁর প্রাণের কোন কিছু—

কথাটা মীরা শেষ করিতে পারিল না। অশ্রুর আভাসে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রকাশ কহিল—পাগল! তার প্রাণের আশঙ্কা করছেন কেন? যত বিপদের মধ্যেই পড়ুক, আত্মহত্যা সে কোন দিন করবে না; পথে কোন বিপদ-আপদ হলে নিশ্চয়ই আমরা এতদিনে টের পেতাম। আর তার এমন কোন শত্রুও নেই যে বিনা কারণে তার অনিষ্ট করবে। তবে আপনি ও-সব সন্দেহ করছেন কেন?

—শত্রু নেই বটে; কিন্তু একজন লোক আছে যে তাঁকে হিংসে করে; এবং সুবিধে পেলে প্রতিশোধ নিতেও পারে!

—প্রতিশোধ নিতে পারে! কে তার এমন—

মীরা কহিল—ডাক্তার অগ্নিবাহন। সে আমায় বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম যে অরবিন্দ-বাবু ছাড়া অন্য কারুকে আমি বিবাহ করব না।

—তাতে কি! আপনি কি মনে করেন যে এর জন্য অগ্নি-বাহন তাকে হত্যা করতে পারে?

মীরা নিম্ন-কণ্ঠে বলিল—ডাক্তার কিন্তু অনেক রকম গুপ্ত-বিদ্যা জানে; তারই সাহায্যে হয়ত তাঁকে কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ করে রেখেছে; কিম্বা হয় ত—

মীরার উদ্বেগপূর্ণ অসমাপ্ত কথায় প্রকাশ হাসি চাপিতে পারিল না ; কহিল—ও সব বুজরুকি ! জুচ্চুরি, ভণ্ডামী ! আপনি শিক্ষিতা মেয়ে হোয়ে ও সব হাম্‌বাগ্‌ বিশ্বাস করেন ?

মীরা মৃদুকণ্ঠে কহিল—না। তবে এত দিনেও ওঁর কোন খবর না পেয়ে আমার কেমন ভয় হচ্চে। তার ওপর গত সপ্তাহে ডাক্তার অগ্নিবাহন আমার সঙ্গে যে রকম ভাবে কথা কইলে তাতে আমার মনে হল—সে নিশ্চয়ই অরবিন্দ বাবুর সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানেই।

—যাই জানুক, অরবিন্দের ওপর কোন অত্যাচার করতে ভণ্ড ডাক্তার কিছুতেই সক্ষম হবে না—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। কিন্তু কৈ ? আপনার সংবাদ-বহ এখনো তো এল না ; সন্ধ্যা তো উত্তীর্ণ হল। আপনাকে কি লিখেছিল ?

—এই যে দেখুন না ;—বলিয়া মীরা তাহার ছোট্ট হাত-ব্যাগটির ভিতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া প্রকাশের হাতে দিল।

প্রকাশ পড়িতে লাগিল—"সবিনয় নিবেদন, কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই পত্র লিখিতেছি। জানাইতেছি যে, পত্র-লেখক নিরুদ্দিষ্ট অরবিন্দ রায়ের সম্বন্ধে কিছু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। যদি টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে পত্র-লেখক নিজে—উপস্থিত হইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিবে…"

প্রকাশ পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় মীরার ইঙ্গিতে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—এক-জন খর্ব্বাকৃতি লোক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাহাদের দিকেই আসিতেছে। প্রকাশ মীরাকে পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

নয়

পঞ্চানন নিকটে আসিয়া সম্মুখে প্রকাশ এবং তাহার পিছনে মীরাকে দেখিয়া একটা প্রকাণ্ড নমস্কার করিয়া মীরার পত্রখানি তাহাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

প্রকাশ বলিল—হ্যাঁ, এ পত্র ওঁরই লেখা। আমরাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর, আপনি অরবিন্দের সম্বন্ধে কি জানেন?

পঞ্চানন তাহার কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার প্রকাশ আর-একবার মীরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বিশেষ কিছুই না, অল্প-স্বল্পই জানি।

মীরা ব্যাকুল আগ্রহে বলিল—কি জানেন, বলুন।

পঞ্চানন তাহার ডান হাতের লম্বা কাগজের মোড়কটি বাঁ হাতে লইয়া ডান হাতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল—আপনার বিজ্ঞাপনে একটা পুরস্কারের উল্লেখ ছিল—

প্রকাশ বলিল—যদি আপনার খবরের কোন মূল্য থাকে তা হলে দেওয়া যাবে।

—কত পাব সেটা একবার জান্‌তে পারলে…

মীরা অধীর হইয়া বলিল—যদি আপনার সংবাদ ঠিক হয় তাহলে আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব, একশো টাকা এখন; বাকী টাকা যখন অরবিন্দ বাবুকে পাওয়া যাবে তখুনি পাবেন।

পুরস্কারের কথা শুনিয়া পঞ্চাননের দুই চোখে খুসীর দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; বলিল—যে আজ্ঞে। আমি সব কথাই বলছি। আগে এই জিনিষটি দেখুন দেখি।

পঞ্চানন তাহার মোড়কটি খুলিয়া একগাছি মোটা বেতের লাঠি মীরার হাতে দিল। তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই মীরা চমকিয়া উঠিল; প্রকাশ বলিয়া উঠিল—বাই জোভ্‌! এ যে দেখছি অরবিন্দেরই লাঠি; এই যে মনোগ্রাম—এ, আর!

পঞ্চানন সাফল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি জানতাম, এ তাঁরই লাঠি, যদিও কর্ত্তা বলেছিল যে লাঠি তাঁর নিজের। তাঁর সে কথা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় নি।

—কে তোমার কর্ত্তা?

—ডাক্তার অগ্নিবাহন রুদ্র।

নাম শুনিয়া শ্রোতা দুই জনেই মনে মনে শিহরিয়া উঠিল; ভীত কণ্ঠে মীরা বলিল—আমি জানি—!

তাহাকে থামাইয়া দিয়া প্রকাশ পঞ্চাননকে বলিল—আপনি কি জানেন সব খুলে বলুন দেখি।

তিনজনে খানিকদূর গিয়া অপেক্ষাকৃত একটি নির্জ্জন স্থানে ঘাসের উপর বসিল। পঞ্চানন তখন বলিতে লাগিল—

আমার নাম পঞ্চানন নন্দী; অগ্নি-বাহন রুদ্রের বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কর্ম্ম করি। তাঁর অদ্ভুত জীবন যাত্রার প্রণালী দেখে প্রথম থেকেই তাঁকে আমার কেমন সন্দেহ হোত। তিনি মোটেই বাড়ি থেকে বার হোতেন না; এবং বাড়িতেও কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না; দিবারাত্র নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকতেন।

তাঁর হুকুম পালন ছাড়া, কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না; এজন্য আমি নিঃশব্দে এবং গোপনে তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে যেতাম, তিনি অবশ্য তা টের পেতেন না।

ইদানীং তিনি রাত্তিরে বাড়ীর গেটের দরজা খুলে রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং আমায় ছুটি দিয়ে নিজে জেগে ঘরে বসে থাকতেন—যেন তিনি সাগ্রহে কার অপেক্ষা করছেন। দিনের পর দিন এমনি কোরে কেটে যেতে লাগল; কিন্তু কারুকে তাঁর কাছে আসতে দেখলাম না।

অবশেষে একদিন রাত্রে আমি ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ কর্ত্তার ঘরে কথা-বার্ত্তার চাপা আওয়াজ শুনতে পেতে লাগ-

লাম। রাত তখন প্রায় দু'টো। এত রাত্রে কে এসে কর্ত্তার সঙ্গে কথা কইছে? অত্যন্ত কৌতুহল হল। ঘরের জান্‌লা খুলে কর্ত্তার ঘরের বন্ধ দরজার ওপর চোখ রেখে সমস্ত রাত জেগে ব'সে রইলাম।

পরদিন সকালে উঠে কর্ত্তার ঘরে গিয়ে দেখি, সমস্ত রাত তিনি চেয়ারে ব'সেই কাটিয়েছেন। অন্য দিনের থেকে সেদিন তিনি অসম্ভব রকম চঞ্চল এবং উত্তেজিত;—এমন অস্থির ভাব তাঁর আগে কখনো দেখিনি। সেই দিনই এই লাঠিটা তাঁর ঘর থেকে পাই, এবং কর্ত্তার অগোচরে সেটি নিজের ঘরে এনে রাখি।

পঞ্চাননের কাহিনী শুনিয়া প্রকাশ মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল—কিন্তু অরবিন্দের নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে এ লাঠির কি সম্বন্ধ?

পঞ্চানন কহিল—সে রাত্রের ঘটনার পর থেকে কর্ত্তা রোজ সকালে উঠেই খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। একদিন ইংরেজী কাগজখানা পড়ে তিনি ট্যাক্সি নিয়ে বালীগঞ্জে যান। পরে সেই কাগজখানা পড়ে আমি অরবিন্দবাবুর সম্বন্ধে আপনাদের বিজ্ঞাপনটি দেখতে পাই। লাঠিতে 'এ-আর' নাম এবং অরবিন্দ রায়ের আদ্যক্ষর মিলে গেল; সেজন্য আমার মনে স্থির ধারণা জন্মাল যে, এ লাঠি অরবিন্দবাবুর-ই লাঠি। আমার কিপ্‌টে মনিব যে সোনা বাঁধান লাঠি কিনবে—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

—তুমি একটি পুরোদস্তুর ডিটেক্‌টিভ! মিস মিত্র, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন?

মীরা মৃদু কণ্ঠে বলিল—আমার মনে হয়, অরবিন্দ বাবু সে-রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীতেই গিছলেন। কিন্তু কেন গিছলেন—তা আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিনে! ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর তো কিছু মাত্র পরিচয় ছিল না। দুজনে কখনো দেখা অবধি হয় নি।

প্রকাশ বলিল—অরবিন্দ ডাক্তারের বাড়ি গিছল, যদি এটা ঠিক হয়, তাহলে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—সে সেখান থেকে চলে এসেছিল কিনা?

পঞ্চানন গম্ভীর ভাবে বলিল—না।

দুই জনেই চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

পঞ্চানন বলিল—যদিও পরে আমি তাঁর কোন সাড়া শব্দ পাইনি, তবুও তিনি যে সে রাত্রে বেরোন নি, এ কথা আমি হলফ কোরে বলতে পারি। যে-রাত্রে অরবিন্দ বাবু আমার মনিবের বাড়ি ঢুকেছিলেন—সেদিন সকাল থেকে ঘোর বর্ষা নেমে ছিল। লাঠি পাবার পর আমি তাঁর পায়ের চিহ্ন অন্বেষণ করেছিলাম। বাড়ির গেট্ থেকে বরাবর আমি তাঁর ভিতরে প্রবেশ করবার জুতোর দাগ দেখতে পাই এবং যদি তিনি সে রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর চলে যাবার জুতোর দাগও দেখতে পেতাম; কিন্তু তা পাইনি, আর আমাদের বাড়ী থেকে বেরোবার ওই একটী ছাড়া আর পথও নেই। তাই মনে হয়—সে রাত্রে অরবিন্দ বাবু সেইখানেই ছিলেন।

—বেশ বেশ। তোমার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। আচ্ছা, ধরলাম, অরবিন্দ সে-রাত্রে সেই বাড়িতেই ছিল। এখন কথা হচ্ছে —ডাক্তারের সঙ্গে যে-ঘরে বসে অরবিন্দ কথাবার্ত্তা বলেছিল, সে-ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছিল কি না।

পঞ্চানন পুনরায় বলিল—না।

তুই-জনে এক সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কেমন কোরে জান্‌লে?

পঞ্চানন বলিল—তার কারণ তো আপনাদের আগেই বলেছি —আমি সারা রাত জেগে জান্‌লা খুলে বসেছিলাম—যদিও ঘরের মধ্যে তুজনে কি বলাবলি করছিল তা বুঝতে পারিনি, তবুও এটা ঠিক যে, যদি কেউ সে ঘর থেকে বেরুতো, তা হলে নিশ্চয় আমি জান্‌তে পারতাম।

প্রকাশ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—যদি অরবিন্দ সে-বাড়ি থেকে কিম্বা সে ঘর থেকে না বেরিয়ে থাকে, তাহলে হয় সে-ঘরে আবদ্ধ আছে, নয় শূন্যে মিলিয়ে গেছে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল—আমার মনে হয়, ডাক্তারের কোন গুপ্ত-ঘর আছে এবং অরবিন্দকে ডাক্তার সেই ঘরেই লুকিয়ে রেখেছে।

মীরা ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে ছিল; বলিল—কিন্তু কেন?

প্রকাশ উত্তর করিল—একটু আগে আপনি যা বলেছিলেন, কারণ হয়ত তাই। হয়ত সত্যিই অরবিন্দের ওপর ডাক্তারের ঈর্ষা ছিল, এবং সেই কারণেই সে তাকে জব্দ করবার জন্যে একটা ফন্দী

খাটিয়েছে। আগে থেকে কিছুই বলা যায় না, কিন্তু সে যাই হোক, এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, সেই ঘর এবং পরে সমস্ত বাড়ি তল্লাস করা।

পঞ্চানন কহিল—কিন্তু কি করে করবেন ; কর্ত্তা তো আজকাল বাড়ি থেকে একদম্ কোথাও বেরোন না।

মীরা বলিল—সে ব্যবস্থা আমি করব। কাকাবাবুকে বলে', ওকে চিঠি লিখিয়ে আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন কোরে আনাব। তারপর, ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে সহজেই তার বাড়ি ঘর খুঁজে দেখা যাবে।

—সেই বেশ কথা ; বলিয়া প্রকাশ পঞ্চাননের দিকে ফিরিয়া বলিল—ততক্ষণ তুমি তোমার মনিবের ওপর একটু নজর রেখো। কিন্তু কোন রকমে তার সন্দেহ জাগিয়ে তুলো না। এবং যদি সে ইতিমধ্যে পালাবার চেষ্টা করে, আমাদের খবর দিও।

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল, পঞ্চানন উঠিয়া দুই হাত কচ্‌লাইতে কচলাইতে বলিল—তা হলে টাকাটা···

মীরা তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া পঞ্চাননের হাতে দিয়া বলিল—তোমার খবর পেয়ে খুসী হয়েছি। যদি অরবিন্দ বাবুকে খুঁজে পাই, তাহলে তোমায় যা দেব বলেছি, তার থেকে আরও অনেক বেশী দেব।

পঞ্চানন মাথা নীচু করিয়া বলিল—যাঁাজ্ঞে।

দশ

দিন দুই কাটিয়া গিয়াছে—

অপরাহ্ণ বেলা।

অরবিন্দ নিজের ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার অগ্নিবাহনের পিছনে একাধিক লোক মিলিয়া যে একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে, এবং তাহার সরকার পঞ্চননই যে তাহার প্রধান পাণ্ডা—এ সকলের কিছুই অরবিন্দ জানিতে পারে নাই।

সে ভাবিতেছিল—আজ সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ যাইবে কিনা। চিঠিতে কেদারবাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এ কথাও জানাইয়াছেন যে মীরা উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। তবে গিয়া কি লাভ? হ্যাঁ; মীরা যে অগ্নিবাহনের সেখানে থাকিবার সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে—একথাও চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

যাই হোক, অরবিন্দ ঠিক করিল, সে যাইবে। তাহার অবসাদ-

ভার-গ্রস্ত মন দিবারাত্র ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। কেদার বাবুর সহিত দু'-দণ্ড আলাপের আনন্দটুকু উপভোগ করিবার সুযোগ সে নষ্ট করিবে না। সে যাইবে।

এদিকে পঞ্চানন ভাবিতেছিল—এই ব্যাপারে কেমন করিয়া তাহার মনিবের নিকট হইতে মোটা-রকম কিছু আদায় করা যায়। আজ সন্ধ্যায় কেদারবাবুর বাড়ি অগ্নিবাহনের নিমন্ত্রণ—তাহা সে চিঠি খুলিয়া দেখিয়া লইয়াছিল। সুতরাং আজ সন্ধ্যায় যদি এই বাড়ি খানা-তল্লাস করিয়া অরবিন্দের মৃতদেহ কিম্বা তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার মনিবকে গিয়া পাকড়াও করিবে—"হয় টাকা দিন; না হয় পুলিশ ডাকবো—হাজারের এক পয়সা কম নয়—"

পঞ্চানন নন্দী নিজের অব্যর্থ ফন্দীর চমৎকারিত্ব দেখিয়া নিজেই পুলকিত হইয়া উঠিল।

বালিগঞ্জের "বাণীকুঞ্জে" তখন মীরা এবং কেদারবাবুর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করিবার পরদিনই মীরা কেদার বাবুকে দিয়া অগ্নিবাহনকে আজ সন্ধ্যায় এইখানে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল।

কেদার বাবু বলিতেছিলেন—তুমিই যদি থাক্‌বে না মা, তাহলে শুধু শুধু অগ্নিবাহনকে নিমন্ত্রণ করলে কেন? বিকেলে কোথায় যাবে?

—তা এখন বলতে পারবো না কাকাবাবু। কাল সকালেই সব কথা জান্‌তে পারবেন—এখন কিন্তু একটি কথাও বল্‌তে পারবো না।

—কার সঙ্গে যাবে?

—প্রকাশ বাবুর সঙ্গে?

—প্রকাশের সঙ্গে? কোথায় যাবে; তাদের বাড়ী?

—না, তাঁদের বাড়ী নয়।

—তবে?

মীরা মিনতি করিয়া বলিল—কাল সব কথা শুনবেন কাকা-বাবু! আজকে আর কিছু জিজ্ঞেস্ করবেন না।

কেদারবাবু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—যা হয় করো; দিন দিন তুমি একটি সমস্যা হোয়ে দাঁড়াচ্ছ।

এগারো

—যদি অরবিন্দ সে-রাত্রে ডাক্তারের এই ঘরে এসে থাকে এবং পরে যদি এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় এই ঘর, কিম্বা এই ঘরের সংলগ্ন কোন গুপ্ত ঘরে আবদ্ধ আছে। যদি আমরা পঞ্চাননের কথায় বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে—এই ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সার্চ্চ্ করে সেই গুপ্তঘরের দরজা খুঁজে বার করা—

সন্ধ্যার পর বারাক্‌পুরে ডাক্তার অগ্নিবাহনের বৈঠকখানা-ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রকাশ মীরাকে এই কথাগুলি বলিতেছিল।

পঞ্চানন অদূরে দাঁড়াইয়াছিল; বলিল—আমি অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছি; কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। আপনি কেমন কোরে পাবেন তা তো বুঝতে পারছি না।

প্রকাশ সে কথার উত্তর না দিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে দাঁড়াইয়া বলিল—দু'দিকের

দেওয়ালে বাইরে যাবার পথ রয়েছে এবং এটাও তাই। ও দেওয়াল দুটো এমন পুরু নয় যাতে-কোরে ওদের ভিতর কোন তৈরী-ঘর থাক্‌তে পারে। সামনে দেওয়ালের পিছনে সিঁড়ি—ওর সম্বন্ধে ওই কথাই খাটে। বাকী রইল পশ্চিম দিকের দেওয়াল। ওর পিছনে কি আছে?

পঞ্চানন বলিল—একটা ছোট্ট ঘর, তা'তে বাড়ীর অ-দরকারী জিনিষ পত্তর থাকে।

—তা হলে ওর ভিতর কিছু নেই।

উপর দিকে চাহিয়া প্রকাশ বলিল—কড়ি কাঠের ওপর?

পঞ্চানন মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল—খালি ছাদ!

প্রকাশ দমিল না; বলিল—এইবার তাহলে মেঝেটা পরীক্ষা করা যাক।

তিন জনে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘরের মেঝে পরীক্ষা করিল; কিন্তু কোন দরজার অংশ দেখিতে পাওয়া দূরে থাক সামান্য ফাটার চিহ্নও কাহারও চোখে পড়িল না। মীরা নিরাশ হইয়া বলিল—নাঃ; এ ঘরে কোথাও কিছু নেই।

সে শ্রান্ত হইয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রকাশ তখন ঘরের পশ্চিম-কোণে অবস্থিত প্রকাণ্ড আলমারিটার চারিদিক দেখিতেছিল; কহিল—নিশ্চয়ই এই ঘরে আছে। আচ্ছা পঞ্চানন, এ ঢাউস্ আলমারিটা এমন বে-জায়গায় ঘরের কোণে ঠেসান্ দেওয়া কেন?

—ওর ভিতর কিছু নেই মশায়।

প্রকাশ কহিল—ভিতরে নয়, ভিতরে নয়। কিন্তু দেখ্‌ছ না, মাথার ওপর একটা আধপোড়া বাতি রয়েছে। এর মানে কি?

—কর্ত্তার সব সময়েই বাতির দরকার হোত; কেন জানি না।

—সব সময়ে বাতির দরকার হোত! হুঁ; প্রকাশ ক্ষিপ্র-হস্তে আলমারিটার পিছনে হাত চালাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। আলমারিটার গঠন এবং সেটাকে দাঁড় করাইয়া রাখার ভঙ্গী প্রকাশের মনে অতিশয় সন্দেহ জাগাইয়াছিল।

মীরা ও পঞ্চানন নির্ব্বাক হইয়া তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিল। দেওয়ালের ছোট্ট ঘড়িটায় টং টং করিয়া আট্‌টা বাজিয়া গেল।

সহসা প্রকাশ চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার হাত একটা ছোট্ট স্প্রিং-এর উপর পড়িতেই সে উহা টিপিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাটকায় আলমারিটা পিছনের দেওয়াল সমেত ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়া গেল এবং পিছনে একটা অন্ধকার গহ্বরের মত দেখা গেল।

ব্যাপার দেখিয়া মীরা অজানা আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল। পঞ্চানন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রকাশ তাহাদের সাহস প্রদান করিয়া, বাতি জ্বালাইয়া সেই

অন্ধকার গর্ত্তের দিকে অগ্রসর হইল, এবং তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে বলিল।

সাবধানে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া তিনজনে একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল। কোথাও কিছু নাই। শূন্য ঘর। মীরা বলিল—এই কি গুপ্ত-ঘর। কোথাও তো কিছু নেই দেখ্ছি।

প্রকাশ বলিল—হতাশ হবেন না। বোধ হয় এটা নয়। তবে এটা ঠিক, এর ভিতর দিয়েই আর একটা ঘরে যাবার পথ আছে। সবাই মিলে দেওয়ালের গায়ে হাত চালান দেখি—যদি কোথাও কোন ছোট্ট বোতাম বা স্প্রিং থাকে,—দেখা যাক।

বলিতে বলিতেই মীরার হাত একটি ছোট্ট বোতাম স্পর্শ করিল; সে উহা সজোরে টিপিতেই সম্মুখের দেওয়ালের খানিকটা সরিয়া গিয়া আর-একটা অন্ধকার ঘর তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল।

প্রকাশ বলিল—পঞ্চানন, শীগ্গির ওপর থেকে গিয়ে দুটো আলো নিয়ে এস।

পঞ্চানন ক্ষিপ্র পদে উপরে উঠিয়া গেল।

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া মীরা ডাকিল—অরবিন্দ বাবু? আপনি আছেন?—কোন সাড়া আসিল না; সভয় কম্পিত চিত্তে মীরা প্রকাশের হাত ধরিল।

প্রকাশ বলিল—ভয় পাবেন না; ওই দেখুন পঞ্চানন আলো নিয়ে এসেছে।

পঞ্চানন দুইটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন লইয়া নীচে নামিল। তখন তিন জনে ধীরে ধীরে সাবধানে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রকাশ বাতিটা উঁচু করিয়া বলিল—ঘরটা দেখে কোন বাজীকারের ভৌতিক গুহা বলে মনে হয়; কি সব অদ্ভুত ছবি···

—কি হোল, য়্যাঁ···?

সহসা পঞ্চাননের হাত হইতে সশব্দে হ্যারিকেনটা মাটিতে পড়িয়া গেল; সে কাঁপিতে কাঁপিতে অদূরে কৌচে-শায়িত মূর্ত্তির দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করিয়া মীরা সেই কৌচের কাছে ছুটিয়া গেল; এবং আলোর সাহায্যে শায়িত লোকটির মুখ দেখিতে পাইবামাত্রই সেইখানে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—এই যে, অরবিন্দ বাবু এখানে রয়েছেন।

পঞ্চানন সত্রাস-কণ্ঠে বলিল—মারা গেছেন!

—মারা গেছে! অসম্ভব;—বলিয়া প্রকাশ অগ্রসর হইয়া গেল।

মীরা আকুল-কণ্ঠে বলিল—না না; সত্যি। ওঁর গা-হাত-পা সব ঠাণ্ডা। চোখ বোজা। বুকের শব্দ নেই।

প্রকাশ বলিল—ডাক্তার ওকে হয়ত কোন মন্ত্র দিয়ে অচৈতন্য কোরে রেখেছে। যাই হোক; আপনি উঠুন। আমি আর পঞ্চানন ওকে ধরাধরি কোরে ওপরে নিয়ে যাই।

সীমাহীন দুঃখের মাঝেও মীরা আত্ম-সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাতে দুইটা আলো ধরিয়া আগাইয়া চলিল। গালের উপর দিয়া তাহার অনিরুদ্ধ অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পঞ্চানন প্রথমে মৃত-দেহ স্পর্শ করিতে অনিচ্ছা জানাইয়া-

ছিল; পরে প্রকাশের ধমকে বিরক্তিপূর্ণ মুখে সে রাজী হইল, এবং দুইজনে অরবিন্দের প্রাণহীন দেহ উপরে তুলিয়া আনিয়া মেঝের উপর শোয়াইয়া দিল।

এতক্ষণ অবধি মীরার ধৈর্য্য ছিল; কিন্তু ঘরের উজ্জ্বল আলোয় তাহার প্রিয়তমের প্রাণহীন অসাড়-শীতল মৃত-দেহ দেখিয়া তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল; মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

প্রকাশ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কেন আপনি অত কাতর হচ্ছেন; আমি শপথ কোরে বলতে পারি অরবিন্দ কখনো মরে যায় নি। তা যদি যেত, তাহলে অনেক দিন আগেই ওর দেহ নষ্ট হোয়ে যেত। কখ্খনো ও মৃত নয়।

মীরা আঁচলে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল; গভীর অব্যক্ত বেদনায় তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল; করুণ কণ্ঠে বলিল—প্রকাশ বাবু, আপনি ঠিক বলছেন?

—ঠিক বল্‌ছি। অরবিন্দ কোন মন্ত্রের প্রভাবে অচেতন হোয়ে রয়েছে; যদি মরে যেত তাহলে এত দিন পরে ওর দেহ এমন তাজা এবং অটুট থাক্‌তো না!

তারপর বিমূঢ় পঞ্চাননের দিকে ফিরিয়া প্রকাশ কহিল—পঞ্চানন, শীগ্‌গির থানায় খবর দাও; আর ফেরবার পথে একজন ডাক্তার সঙ্গে কোরে এন।

পঞ্চাননকে দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না। চক্ষের নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে সে বাহির হইয়া গেল।

বারো

কেদার বাবুর সহিত অগ্নিবাহন-রূপী অরবিন্দ কথাবার্ত্তা কহিতেছে এমন সময়ে বেহারা আসিয়া অরবিন্দকে বলিল—বাবু, আপনাকে একজন লোক ডাক্‌ছেন; বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

কেদারবাবু বলিলেন—ডেকে নিয়ে আয় না এখানে।

বেহারা বলিল—তিনি এলেন না; বল্‌লেন, জরুরী দরকার; পাঁচ মিনিটের জন্যে ওঁকে বাইরে যেতে হবে।

কে এ রূপ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে এতদূরে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে—অরবিন্দ তাহা ভাবিয়া পাইল না। কেদার বাবুকে বলিল—আচ্ছা, আমি একবার দেখা করেই আসি।

বাহিরে আসিয়া দেখিল—একখানা ট্যাক্সির পাদানির উপর একটা পা রাখিয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া—পঞ্চানন!

বিস্মিত কণ্ঠে অরবিন্দ বলিল—ব্যাপার কি পঞ্চানন?

পঞ্চানন ব্যস্ত হইয়া বলিল—উঠে পড়ুন গাড়িতে, বলছি সব। অনেক কথা—

তাহার কথার ধরণে অরবিন্দের বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল ; বলিল—অনেক কথা ? কি কথা বল না।

—আগে উঠুন গাড়িতে।

কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত অরবিন্দ গাড়ির ভিতর উঠি-তেই, পঞ্চানন একলাফে ভিতরে উঠিয়া বলিল—চালাও।

ট্যাক্সি ফাঁকা রাস্তায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

গাড়ির ভিতর বসিয়া পঞ্চাননের মুখ হইতে সকল ঘটনা শুনিতে শুনিতে নিদারুণ ভয়ে এবং বিষম সমস্যার অভিঘাতে অরবিন্দের অন্তর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা পঞ্চানন হাঁকিল—সবুর !

গাড়ি একটা শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। পঞ্চানন নামিয়া তাহার মনিবকে হুকুম করিল—নেমে আসুন।

পূর্ব্বেকার সে বিনীত দাস-ভাব আর নাই ; উদ্ধত পঞ্চানন আজ যেন জয়ের দম্ভে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

—এখানে কোথায় নাম্‌ব ?

—আসুন না...

এস্থলে অধিক বাক্‌-বিতণ্ডা করা সুবিবেচনার কার্য্য নয় ভাবিয়া, অরবিন্দ গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া পঞ্চাননের পিছনে

পিছনে, পথের পাশে একটা অতি পুরাতন জীর্ণ বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ট্যাক্সি পঞ্চাননের আদেশে দাঁড়াইয়া রহিল।

—এ বাড়িটা আমার এক পূর্ব্বপুরুষের ছিল। ভয় পাবেন না, এই দাওয়ার ওপর বসুন। তারপর, কি করবেন ঠিক করলেন? এতক্ষণে পুলিস বোধ হয় আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

অরবিন্দ নিজকে সম্পূর্ণরূপে ক্রূর পঞ্চাননের করায়ত্ব দেখিয়া, প্রকাশ্যে বিশেষ কোন ক্রুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করিল না; বলিল—তুমি কি করতে বল?

পঞ্চানন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া বলিল—একটি হাজার টাকা যদি আমায় দেন, তাহলে আপনার নিরাপদে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারি। মটর দাঁড়িয়েই আছে। এখান থেকে সোজা কলকাতায় চলে যান। তারপর কালকের ট্রেণে কাশী রওনা হ'য়ে পড়ুন। ব্যস্।

অরবিন্দ তাহার নিকট হইতে এইরূপই একটা কথা প্রত্যাশা করিতেছিল; বলিল—টাকা যদি না দিই?

—তাহলে বাধ্য হোয়ে পুলিস ডাক্‌ব।

—হুঁ।

অরবিন্দ স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পঞ্চানন মনে করিয়াছিল, তাহার মনিব অগ্নিবাহন এই সকল ব্যাপার শুনিয়া এবং তাহার কবলে পড়িয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অগ্নিবাহনের শান্ত অচঞ্চল ভাব দেখিয়া সে নিজেই অধীর হইয়া উঠিল; কটু-কণ্ঠে কহিল—অরবিন্দ রায়কে

খুন কোরে, এখন আর সাধু সাজবার চেষ্টা করলে চলবে না মশায়। হয় টাকা দিন ; না হয়—

—তাকে খুন করেছি তোমায় কে বললে ?

—কে আর বলবে, আমি নিজে দেখেছি। যে-রাত্রে তিনি আপনার কাছে এসেছিলেন, তার পর-দিনই আমি সব টের পাই। তারপর আপনার ঘর থেকেই আজ লাস বেরিয়েছে।

—মৃতদেহ এখন কোথায় ?

—প্রকাশবাবু তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ডাক্তার-টাক্তার এসেছিল অনেক। এতক্ষণে বোধ হয় লাস জ্বালিয়ে দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

এই খবর পাইয়া অরবিন্দ চমকিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি একটু বাইরে গিয়া দাঁড়াও, আমি ভেবে ঠিক কোরে নিই—কী করব।

পঞ্চানন মনে করিল, ডাক্তার তাহার পলায়নের ব্যবস্থার কথা ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইবে ; কহিল—তা যাচ্ছি ; তবে ওটা যেন পুরোপুরী এক হাজার-ই হয়। বলিয়া সহর্ষচিত্তে বাহির হইয়া গেল।

সেই নির্জ্জন ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া অরবিন্দ চিন্তার অতল সমুদ্রের মাঝে তলাইয়া গেল ; কি যে করিবে, ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইল না।

যদি পঞ্চাননের প্রস্তাবে সে রাজী না হয়, তাহা হইলে পুলিসে

গিয়া অরবিন্দ রায়ের হত্যার জন্য তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে এবং তাহার ফল যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া অরবিন্দ শিহ-রিয়া উঠিল। এদিকে আবার তাহারই দেহ যখন অনতিবিলম্বে চিতার আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে, তখন তাহার আত্মা নিজের দেহে আর কোনদিন ফিরিয়া যাইতে পারিবে না; বাকী দীর্ঘ দিন হয়ত একটা অনন্ত আর্ত্ত স্বরের মত আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবে।

পুলিসের নিকট এ সকল অদ্ভুত কথা কিছুই গ্রাহ্য হইবে না; বিচারপতি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। পঞ্চাননের যেরূপ হিংস্র প্রকৃতি, টাকা পাইয়া সে যে নিরস্ত হইবে, এমন মনে হয় না। টাকা লইয়া পুলিসে খবর দিয়া নিজে সরিয়া পড়িবে।

সুতরাং এ সমস্যার এখন কি সমাধান করা যায়?

বুদ্ধিভ্রষ্ট অরবিন্দের অন্ধকার চিত্তাকাশে সহসা সমাধানের একটি বিজলী রেখা ঝলসিয়া গেল।

অগ্নিবাহন তাহাকে বলিয়াছিল, যদি অপঘাতে কিম্বা আত্ম-ঘাতে অগ্নিবাহন-রূপী অরবিন্দের মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে অরবিন্দের আত্মা পুনরায় নিজের দেহে ফিরিয়া আসিবে। ঠিক! এই তো সহজতম উপায় রহিয়াছে! সে এখনি এই জীর্ণ দেহের আবাস পরিত্যাগ করিবে।

কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ও সহজে মিলিয়া গেল।

অগ্নিবাহন একটি ছোট চামড়ার ব্যাগে কতকগুলি গাছগাছ্ড়ার শিকড় সর্ব্ব সময়ে নিজের কাছে রাখিত। তাহাদের পরিচয়-লিপিগুলি পড়িয়া অরবিন্দ জানিয়াছিল—সে গুলি বিভিন্ন রোগের ঔষধ। তাহার মধ্যে একটি শিকড় ছিল—ভয়ানক বিষাক্ত; তাহার রস কোন রকমে একবার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ মানুষের মৃত্যু অবধারিত। সেই ঔষধ সমেত ব্যাগটি অরবিন্দের পরণের লম্বা কোটের পকেটে ছিল। সে উহা বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্যেকার বিষাক্ত শিকড়টি তুলিয়া লইল।

এমন সময়ে পঞ্চানন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আর কতক্ষণ ভাববেন। তা'হলে টাকাটা লিখে দিন—আপনার চেক-বই আমি সঙ্গে কোরেই এনেছি।

—তোমার মত শয়তানকে এক পয়সাও দেব না!—বলিয়া অরবিন্দ শিকড়টা মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল।

পঞ্চানন প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই; তাই বলিল—তা'হলে আমি পুলিসে খবর দিই।—কিন্তু পরক্ষণেই অগ্নিবাহনের মুখের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে সভয়-বিস্মিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

ডাক্তার অগ্নিবাহনের সমস্ত মুখ সহসা নীল হইয়া গেল, দুই হাত ঊর্দ্ধে উঠিল; বিকৃত কণ্ঠ অব্যক্ত স্বরে বারেকের জন্য কি বলিবার চেষ্টা করিল—পরমুহূর্ত্তেই তাহার অসাড় প্রাণহীন দেহ মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল।

তেরো

অরবিন্দের কাছে পঞ্চানন মিথ্যা কথা বলিয়াছিল—

তাহার দেহ প্রকাশের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় নাই, এবং তাহার সৎকার করিবার জন্যও কোন উদ্যোগ করা হয় নাই। তাহার দেহ পুলিস পাহারায় অগ্নিবাহনের বাড়িতেই ছিল; এবং মীরা ও প্রকাশ তখনো সেইখানে সেই ঘরেই বসিয়াছিল।

অগ্নিবাহন তাঁহার বাড়ি পরিত্যাগ করিবার কিছু পরেই টেলিফোনে খবর পাইয়া কেদার বাবু মোটরে করিয়া ডাক্তারের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসক আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া, তাহা মৃত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। সবাই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘরের ব্র্যাকেট ঘড়িটার টক্‌টক্ আওয়াজ ছাড়া চারিদিকে একটা মর্ম্মন্তুদ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

•

কিছুক্ষণ পরে বাহির হইতে ইন্‌স্‌পেক্‌টার সসম্ভ্রমে জানাইল, এই বার তাঁহাদের সকলের বাড়ী পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে; কারণ রাত্রি বারোটা বাজে এবং তাঁহারা প্রস্থান করিলে তবে পুলিস বাড়ীতে চাবী লাগাইয়া দিবে।

কেদার বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—চল, যাওয়া যাক্ ; ওঠ মা !

শ্রান্ত অভিভূত মীরা নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশের তখনো ধারণা অরবিন্দ মরে নাই। ইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকিয়া বলিল—কাল সকালেই আমরা আবার আসবো ; ইতিমধ্যে যদি ওঁর সুস্থ হবার কোন লক্ষণ দেখতে পান, আমাদের খবর দিতে বিলম্ব করবেন না। আর, নয় তো, আজ রাত্রে আমি এখানেই থাকি।

কেদারবাবু ঈষৎ বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলিলেন—কি পাগলের মত বক্‌ছেন প্রকাশ বাবু ; শুধু শুধু এখানে থেকে ফল কি ? যে মরে গেছে সে কখনো আবার বেঁচে ওঠে ?

প্রকাশ শান্ত-কণ্ঠে বলিল—আপনার সঙ্গে আমার ওই জায়গায় মিল্‌ছে না। আমার এখনও দৃঢ় ধারণা—অরবিন্দ মরেনি ; ও শুধু মূর্চ্ছিত হোয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, শয়তান অগ্নিবাহন ওকে মন্ত্র প্রভাবে হিপ্নটাইজ কোরে রেখেছে।

আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিবার পর ইন্‌স্‌পেক্টার

বলিল—যদি দরকার হয়, আপনাদের আমি নিশ্চয় খবর পাঠাবো। এইবার কিন্তু আপনাদের যেতে হবে।

তখন তিনজনেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া অরবিন্দকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য মীরা ঘরের মধ্যে ফিরিয়া চাহিল। সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। নীল-কাঁচ মণ্ডিত বৈদ্যুতিক আলোর অল্পতায় ঘরের অন্ধকার যেন আরও জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সেই আলো-অন্ধকার মেঝের উপর অরবিন্দের মৃতদেহ শায়িত। তাহার চক্ষু মুদ্রিত, ওষ্ঠ বিবর্ণ, মুখ পাংশু!

মীরা একটা বড় ফুলের তোড়া অরবিন্দের বুকের উপর দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল; তাহারই উগ্র গন্ধে ঘরের রুদ্ধ বাতাস যেন ভারি হইয়া উঠিয়াছে।

তিনজনে দ্বার-মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের সেই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সহসা ঘরের ব্র্যাকেট-ঘড়িটায় টং টং করিয়া রাত্রি বারোটা বাজিতে লাগিল;—ঘড়ির ঘণ্টায় একটার পর একটা বাজিয়া চলিল এবং অভিভূত দর্শক তিনজন স্তব্ধ হইয়া একের পর এক সেই বাজনার শব্দ গণিয়া যাইতে লাগিল। শব্দের শেষ সুর

যখন শূন্যে মিলাইয়া গেল, ঘরের মধ্যেকার নির্জ্জনতা তখন যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল।

তাহার পরেই এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল——

মেঝের উপর শায়িত নিস্পন্দ দেহ সহসা নড়িয়া উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিল। দুই একবার শ্বাস ফেলিবার পরেই বুকের উপর হইতে হাত দুইটী পাশে ঝুলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের তোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুকের উঠা-নামার সহিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সুস্থ মানুষের মতো সহজ ভাবে বহিতে লাগিল।

তিনজনে অপার বিস্ময়ে হতবাক হইয়া নিস্পলক নেত্রে পুনর্জ্জীবন লাভের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে যখন অরবিন্দ চোখ মেলিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করিল তখন তাহাদের সেই বিহ্বল ভাব কাটিয়া গেল; প্রকাশ এবং কেদার বাবু ছুটিয়া ভিতরে ঢুকিল এবং মীরা চেতনা হারাইয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল।

কেদার বাবু অরবিন্দের মাথাটা ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বসাইয়া দিলেন। প্রকাশ নিজের বিশ্বাসের বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল স্বরে বলিল,—বলেছিলাম, অরবিন্দ শুধু অচৈতন্য হোয়ে আছে, কখ্‌খনো—

ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বিস্ময়-বিস্ফা। নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতেছিল ; বলিল—ওয়াণ্ডারফুল্ !

অরবিন্দ কথা কহিল ; মৃদু-স্বরে ডাকিল,—মীরা কোথায় ? মীরা !

অদূরে মাটীর উপর বসিয়া মীরা সেই প্রিয় স্বর শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবসন্ন দেহটাকে কোন মতে টানিয়া আনিয়া অরবিন্দের কোলের উপর নিজের মাথাটা রাখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

—শেষ—